ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র

আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ্

ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ্

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র
আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ্

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৩৮৮/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-1114-3

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৮৭ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ
মে ২০০৭
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪
রবিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রুফ সংশোধন
মোঃ আজিজুল কাইয়ুম

বর্ণবিন্যাস
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি. পি. ক ৩৮, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা

ISLAMI AIN O RASHTRO (Islamic Law and State) : Written by Abul Kashem Muhammad Sifatullah and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. May 2007
Web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 30.00; US Dollar : 1.00

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. ইসলামী আইনের উৎস, ক্রমবিকাশ ও প্রয়োগ ৭
২. বর্তমান বিশ্ব ঃ ইসলামী আইন ২৯
৩. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা ৩৪
৪. ইসলামী রাষ্ট্র ৩৬
৫. ফকীহ ও ইমামদের মতভেদের অভিযোগ ৪৬
৬. অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণের অভিযোগ ৪৮
৭. ইসলামী আইন ও দাস প্রথা ৫০
৮. ইসলামী আইন ও মানব রচিত আইনের মৌলিক পার্থক্য ৫৩
৯. বর্তমান বিশ্ব ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি ও সঠিক কর্মসূচি ৫৬
১০. ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কার্যসূচি ৫৮
১১. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ৬৩
১২. ইবনে খালদুনের রাষ্ট্র দর্শন ৭৬

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মানুষের সামগ্রিক জীবনধারা যে বিধি-বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাই হচ্ছে আইন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের সংজ্ঞা হচ্ছে–সমাজে যেসব ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস, রীতি-নীতি ও পদ্ধতি সার্বজনীন নিয়মে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ও মানুষের জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বলবত করা হয়েছে তাই হচ্ছে আইন।

পক্ষান্তরে ইসলামী আইনের অর্থ আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই আইন দেশ কালের ঊর্ধ্বে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত। মানুষ সসীম, মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিও সসীম। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষের দ্বারা রচিত আইন কখনোই সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারে না। আর এ জন্যই মানুষের রচিত কোন আইন একটি সমাজের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হলেও অন্য সমাজে তা কল্যাণকর বিবেচিত নাও হতে পারে। যেহেতু ইসলামী আইনের উৎস আল্লাহ্ তা'আলার কালাম সেহেতু একমাত্র ইসলামী আইনেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম ও লেখক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ তাঁর 'ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র' শিরোনামের বইটিতে ইসলামী আইনের রূপরেখা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বে এর প্রয়োজনীয়তার কথা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছেন। বইটি ইসলামী আইনের স্বরূপ জানার ক্ষেত্রে সবিশেষ ভূমিকা রাখবে বিবেচনায় এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা আশা করি বইটি এবারও আগের মতো সুধী পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার মরহুম আব্বা আশিক বিল্লাহ্ মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ্‌র রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে–

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী আইনের উৎস, ক্রমবিকাশ ও প্রয়োগ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وعلى من دعابدعوته الى يوم الدين ـ اما بعد

প্রাথমিক কথা

আজকের বিশ্ব অগণিত সমস্যার সম্মুখীন। অন্তহীন সমস্যার আবর্তে মানব সভ্যতা আজ জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত ও পর্যুদস্ত। মানব জীবনকে আজ সমস্যার স্তূপ বললে একটুও অতিরঞ্জিত হবে না। বিশ্বমানবতা আজ এ সর্বাত্মক ও সামগ্রিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চায়, চায় তারা সমস্যামুক্ত, শোষণহীন, সুখী, সমৃদ্ধিশালী, প্রগতিশীল ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব সমাজ গড়ে তুলতে। কিন্তু ১৬শ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় পর্যন্ত মানব জীবনে শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যাঙের ছাতার মতো মানব সৃষ্ট বহু মতবাদ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এসব মানব রচিত মতবাদ শান্তি স্থাপনের ও সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে জীবনকে করে তুলেছে আরো সংকটময়, সমস্যাসংকুল। ১৬ শতাব্দীতে গির্জা ও সিংহাসনের সংঘাত জন্ম দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র আর এ ধর্মহীন গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতিতে উদ্ভব হয়েছে চরম নির্যাতনমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদ।

লাগামহীন পুঁজিবাদী অর্থাব্যবস্থার ঘোড়ার দাপটে পিষ্ট হয়েছে মানবতা, নির্যাতিত হয়েছে বঞ্চিতের দল। বিদায় নিয়েছে নৈতিকতা, উদারতা, মহানুভবতা, কল্যাণ কামনার মহান মানবীয় গুণাবলী। মানুষ নিকৃষ্ট পশুর চেয়েও ঘৃণ্যতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। হারিয়েছে মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মৌলিক অধিকার। সমাজের সমস্ত সম্পদ—গুটিকতক পুঁজিপতি জালিমের হাতে হয়েছে কুক্ষিগত। গণতান্ত্রিক ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে এক শ্রেণীর মানুষ পেলো গগনচুম্বী প্রাসাদ তৈরি ও বিলাসের প্লাবনে ভেসে যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

আর সমাজের অগণিত বঞ্চিত, সর্বহারা, বুভুক্ষু ও দরিদ্র জনগণ পেলো নগ্নদেহে বিনা চিকিৎসায় ফুটপাথে পড়ে থেকে না খেয়ে মরার স্বাধীনতা। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত বিশ্বের কল্যাণকামী চিন্তানায়কগণ এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চিন্তা গবেষণা শুরু করলেন। অবশেষে হেগেল ও ডারউইনের চিন্তার উচ্ছিষ্ট দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নির্যাস থেকে মহাত্মা কার্ল মার্কস আবিষ্কার করলেন মুক্তির এক নতুন মতবাদ 'সমাজবাদ'। পুঁজিবাদের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে শান্তি ও মুক্তির শ্লোগান নিয়ে জন্ম নিল সমাজবাদ। বিপুল যুবশক্তিকে আকৃষ্ট করলো এ প্রান্তিক অবাস্তব সমাজবাদী চিন্তাধারা। নৈতিকতা, ধার্মিকতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মানুষকে আরো নিম্নস্তরের পশু বানিয়ে লাখো লাখো মানুষের খুনের সমুদ্র সৃষ্টি করে বিশ্বের একাংশে বিপুল জনতার উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো সমাজতন্ত্রের বিভীষিকা। কার্ল মার্কস অত্যন্ত লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনার মাধ্যমে বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন তাঁর এ প্রান্তিক চিন্তাধারা। তাঁর এ মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করলেন লেলিন ও স্তালিন। অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পেশ করলেন ব্যক্তি-মালিকানার বিরুদ্ধে যুক্তি। পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী পোপ ও ধর্মযাজকেরা যুক্তি পেশ করলেন তার বিরুদ্ধে যে, ধর্মও তো ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এবার মার্কসবাদীরা তড়িত গতিতে জবাব দিলেন, "ধর্মের নামে এ আফিম আমরা আর জনগণকে সেবন করতে দেব না। ধর্মযাজকেরা প্রতি-উত্তরে বললেন, "ধর্ম তো স্রষ্টার তরফ হতে নিয়ে এসেছেন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত মহামানব ও স্বর্গীয় দূতেরা।" এবার মার্কসবাদীরা জবাব দিলেন যে, এঙ্গেলস ও প্রফেটগণ নির্যাতনমূলক পুঁজিবাদী ব্যক্তি-মালিকানার স্বীকৃতিমূলক ধর্ম নিয়ে এসেছে। ওরা পুঁজিবাদের দালাল।

ধর্মযাজকেরা বললেন, স্বর্গীয় দূত ও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত মহামানবগণ নিজে নিজে আসেন নি, তাদেরকে বিশ্বস্রষ্টা প্রেরণ করেছেন। এবার মার্কসপন্থীরা তাঁদের প্রান্তিক চিন্তার চূড়ান্ত ফসল নাস্তিক্যবাদের প্রচারে নেমে আসলেন। তাঁরা বললেন, "কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই, মানুষই কাল্পনিকভাবে স্রষ্টার বিশ্বাস নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছে"; আর যদি এমন কোন স্রষ্টা থেকেও থাকেন যিনি পুঁজিবাদভিত্তিক ধর্ম ব্যবস্থা দিচ্ছেন, তিনি মানুষের কল্যাণকামী নন বরং তিনি সর্বহারা মানুষের দুশমন। নাস্তিক্যবাদী সমাজবাদ গোটা বিশ্বে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে; মুক্তি, শান্তি ও প্রগতির শ্লোগানে মুগ্ধ হয়ে কোটি কোটি মানুষ এ ভ্রান্ত মতাদর্শকে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু এ অবাস্তব সমাজবাদ মানব জীবনে শান্তি স্থাপনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আজ সারা বিশ্বে মানব রচিত মতবাদের যাঁতাকল থেকে মুক্তি লাভ করে খোদায়ী জীবন দর্শন ইসলামী আদর্শের বুনিয়াদে জীবন পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দিকে দিকে ইসলামী বিপ্লবের গগনবিদারী আওয়াজ উত্থিত হয়েছে। মানব

www.pathagar.com

রচিত ভ্রান্ত মতবাদকে উৎখাত করে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়িত করার ও বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চলছে তুরস্কে, ইরানে, সৌদী আরবে, খুলাফায়ে আরব আমীরাতে, মিসরে, পাকিস্তানে, সিরিয়ায় এমনকি বাংলাদেশ তথা গোটা বিশ্বে। দেশে দেশে গড়েছে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন।

ইসলামী আইনের অপরিহার্যতা

মানুষ সসীম, মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞানও সসীম। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষ কখনও মানব জাতির জন্য অসীম কল্যাণকর বিধান প্রণয়ন করতে পারে না। তাই আজকের বিশ্বের সর্বব্যাপী সমস্যার সমাধান একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। তাই তো বিশ্বের সর্বত্র এ দাবি আজ অত্যন্ত জোরদার হয়ে দেখা দিয়েছে। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী আজ বিদায় নিয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী আজ ইসলামী বিপ্লবের পয়গাম নিয়ে সমাগত। আজ ঈমানের প্রত্যয়ে একান্ত দৃঢ়তার সাথে আমরা ঘোষণা করতে পারি যে, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী ছিল ইসলামের পুনর্জাগরণ আন্দোলনের দাওয়াত ও সংগঠনের শতাব্দী; আর হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী হচ্ছে ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার শতাব্দী। মানব রচিত মতবাদগুলো মানব জাতির সমস্যা সমাধানে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই ইতিহাসের বাস্তব প্রয়োজনেই আজ ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

ইতিহাসের এ অপরিহার্য প্রয়োজন ও দাবিকে আজ বিশ্ব মুসলিমকে পূরণ করতেই হবে। আজ এটি প্রমাণিত সত্য যে ইসলাম ছাড়া মানুষের মুক্তির জন্য আর কোন পথ নেই।

যুগে যুগে ইসলামই মানব জাতিকে মুক্তির সন্ধান দিয়েছে। হযরত আদম (আ) থেকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সকল আম্বিয়ায়ে-কিরামই আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামী মূল্যবোধকেই মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (সা) ইসলামের সর্বশেষ পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইসলাম বিভিন্ন উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়েও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আদর্শিক স্বকীয়তার সংরক্ষণ করেছে। মানব সভ্যতার উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছে। আজ বিশ্বমানবতার মুক্তি ও কল্যাণের ক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামই ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলে আগামী দিনের সূর্যোদয় যতটা সত্য ও বাস্তব, ইনশাআল্লাহ্ আগামী দিনগুলোতে ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠাও তেমনি সত্য ও বাস্তব। ইসলামের এ পুনঃ প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ বিশ্বনবী (সা) তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেও করে গেছেন। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে ঃ

www.pathagar.com

اِنَّ اَوَّلَ دِيْنِكُمْ نَبُوَةٌ وَرَحْمَةٌ فَتَكُوْنُ فِيْكُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلاَلَهُ ثُمَّ تَكُوْنُ خَلاَفَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النَّبُوَةِ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلاَلَهُ ـ ثُمَّ تَكُوْنُ مَلَكًا عَاضًا ـ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلاَلَهُ ثُمَّ تَكُوْنُ مَلَكًا جَبَرِيَّةً فَتَكُوْنُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلاَلَهُ ثُمَّ تَكُوْنُ خَلاَفَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَةِ تَعْمَلُ بِسُنَّةِ النَّبِيِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُبْقَى الاِسْلاَمُ بِجِيْرَانِهِ فِي الاَرْضِ تَرْضَى بِهِ سَاكِيْنَ فِى السَّمَاءِ وَالاَرْضِ لاَتَدَعُ السَّمَاءِ مِنْ قَطَرِ الاِصْبَّةِ مِدْرَارً وَّلاَتَدْعُ الاَرْضُ مِنْ نَّبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا شَيْئًا اِلاَّ اَخْرَجَهُ ـ (تقوية الايمان)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন—আমার যুগ হচ্ছে নবুয়ত ও রহমতের যুগ এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী এর স্থিতি হবে। অতঃপর নবুয়তের যুগের পরিসমাপ্তি খিলাফতে রাশেদার যুগ শুরু হবে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী এর স্থিতির পর পুনঃ এ যুগের অবসান ঘটবে। এরপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের যুগ, আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী এর স্থিতির পর পুনঃ অবসান ঘটবে, অতঃপর শুরু হবে একনায়কত্বের যুগ, আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী স্থিতির পর জুলুমমূলক একনায়কত্বের অবসান ঘটে আবার খিলাফতে রাশেদার যুগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকারী প্রশাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ রাসূলের পদ্ধতি অনুসারে দেশ পরিচালনা করবেন। আসমান যমীনের অধিবাসীরা তাঁদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে বরকত বর্ষণ করবে, যমীন তার উৎপাদন বরকত ও তার গর্ভ-স্থিত গোপন সম্পদরাজি উদগীরণ করে দেবে। —তাকভিয়াতুল ঈমান

ইতিহাসের কষ্টিপাথরে আলোচ্য হাদীসটিকে বিশ্লেষণ করলে কি এ সত্য উদ্ভাসিত হয় না যে রাসূলের যুগ নবুয়তের ও রহমতের যুগ হিসেবে অতিবাহিত হয়ে গেছে। হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হাসান (রা) ও হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর যুগ খিলাফতে রাশেদার যুগ হিসেবে অতিবাহিত হয়েছে। উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতিমীয়া, উসমানিয়া খিলাফত ও মোগল যুগ ইত্যাদি রাজতন্ত্রের যুগ হিসেবে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর বর্তমানে যবরদস্তিমূলক একনায়কত্বের যুগ অতিবাহিত হচ্ছে। কারণ

www.pathagar.com

একনায়কত্ব বলতে শুধু ব্যক্তির শাসনকেই বোঝায় না, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যক্তি, গোষ্ঠির দলীয় শাসনকে রাষ্ট্রনীতির পরিভাষায় একনায়কত্ব বলা হয়।

ইতিহাসের ৪টি যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যদি আমাদের সামনে বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবে চতুর্থটি সত্য হওয়ার ব্যাপারেও কোন দ্বিধা-সংকোচ ও সন্দেহ থাকতে পারে না। আজ বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে একান্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, বিশ্ব ইতিহাস দ্রুতগতিতে ইসলামী জীবনাদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং গোটা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ইতিহাসের দাবিকে পূরণের জন্যই আজ ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইসলামী বিপ্লবের ক্রমাগত প্রভাব ও বাতিল শক্তির মিথ্যা প্রচারণা ও আতঙ্কগ্রস্ত মানসিকতার অসহনীয় প্রকাশ ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার শুভ ইঙ্গিতই বহন করছে।

আইনের সংজ্ঞা

আইন বা কানূন (Law) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নিয়ম-পদ্ধতি, বিধি-বিধান। সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন স্তরে, প্রাকৃতিক জগতে, জীবজগতে, সামাজিক জীবনে—সৌরমণ্ডলে যে নিয়ম চালু রয়েছে আভিধানিক দিক থেকে তাকেও আইন বলা হয়। পাখির ডিম প্রসব, ডিম থেকে বাচ্চার জন্ম, ক্রমবিকাশের মাধ্যমে তা আবার একটি বড় পাখির রূপ ধারণ করা। বীজকে মাটিতে পুঁতে রাখা, তা থেকে কচি চারা গাছের উদ্‌গম হওয়া, চারাগাছ এক বিরাট বৃক্ষে পরিণত হওয়া, শুক্রকীট থেকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ জীবে রূপান্তরিত হওয়া—এর সবকিছুই এক চিরন্তন নিয়মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই আভিধানিক অর্থে এগুলোই আইন। এসব কিছুকে প্রাকৃতিক আইন (قانون فطرت) বলা হয়ে থাকে। সৃষ্টিজগতে প্রাথমিকভাবে আইনকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—প্রাকৃতিক আইন (قانون فطرت) ও নৈতিক আইন (قانون اخلاق)। প্রাকৃতিক বিধান অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয়। কোন সৃষ্টি এ প্রাকৃতিক আইনের বিরোধিতা করতে পারে না।

কিন্তু নৈতিক আইন পালন করা না করার ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মশক্তির সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষের সামগ্রিক জীবনধারা যে সামগ্রিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাই আইন। এ আইন আবার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দু'ভাগে বিভক্ত—ফৌজদারী আইন ও দেওয়ানী আইন। সামগ্রিক দিক থেকে আইনের আরো বহু বিভাগ রয়েছে—পারিবারিক আইন, সামাজিক আইন; রাষ্ট্রীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইন। সমস্ত জীবনধারা বা নিয়ম-কানূনকে আইন বলা হলেও রাষ্ট্রনীতির পরিভাষায় আইনের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

অনুশাসনকে আইন বলে। অন্য অর্থে যে সকল নিয়ম পদ্ধতি বিধি-বিধান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে এবং যা অমান্য করলে অমান্যকারীদেরকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে শাস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাষ্ট্র দর্শনে তাকেই আইন বলা হয়। কোন কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ শুধু সার্বভৌম শক্তির নির্দেশকেই আইন বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের সংজ্ঞা হচ্ছে—সমাজে যে সকল ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস, রীতিনীতি ও পদ্ধতি সার্বজনীন নিয়মের আকারে সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে ও সরকারী অধিকার ও ক্ষমতা তথা সার্বভৌমত্বের দ্বারা জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বলবৎ করা হয়েছে তা-ই হচ্ছে আইন।

ইসলামী আইনের সংজ্ঞা

খোদায়ী সার্বভৌমত্বের বুনিয়াদে কুরআন ও সুন্নাহ্ নির্দেশিত কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে গবেষণাপ্রসূত যে সার্বজনীন নিয়ম-পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণা ও বিধি-বিধান গণ-জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে গৃহীত ও বলবৎ করা হয়, তাকেই ইসলামী শরীয়ত বা ইসলামী আইন বলা হয়।

সমাজ গঠনে আইনের অপরিহার্যতা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন সুসভ্য সমাজ গড়ে উঠা সম্ভব নয়, আইন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ, আইন সুসভ্য সমাজ গঠনের সোপান, আইন মানবাধিকার রক্ষা করার গ্যারান্টি। আইন সুষ্ঠু ও সংঘবদ্ধ সমাজ গঠনের নির্ভুল মাধ্যম। আইন অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতন প্রতিরোধের একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থা। নির্ভুল ও সুষ্ঠু আইন সার্বজনীন কল্যাণের উৎস। আইন সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও সুষম বণ্টন পদ্ধতির একমাত্র মাধ্যম। সুসভ্য সমাজ গঠনে ও মজবুত স্থিতিশীল নিয়ম-পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত মানব সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নির্ভুল আইনের অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে। সুশৃঙ্খলিত আইনের বন্ধনহীন সমাজ পশুর চেয়েও নিকৃষ্টতম।

আইনের লক্ষ্য

মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধন, ধ্বংস, পতন ও ক্ষতির হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা আইনের অন্যতম লক্ষ্য। আইন মানব জাতিকে কল্যাণ ও প্রগতির পথে পরিচালিত করে, আইন চক্রান্ত ও স্বার্থপরতা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করে। আইন মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের পথকে সহজতর ও উন্মুক্ত করে। সর্বোপরি আইন নৈতিক দেউলিয়াপনা ও অবক্ষয় থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করে মানবীয় মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে।

www.pathagar.com

বর্তমানে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবন দর্শনের বুনিয়াদে রচিত মানুষের মনগড়া আইন, আইনের উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতারই প্রমাণ দিয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে রচিত আইন মানুষের মৌলিক গুণাবলী ও মানবীয় মূল্যবোধকে সমাধিস্থ করেছে। মানুষকে হিংস্র পশুতে পরিণত করেছে। মানুষে মানুষে হানাহানী, মারামারি সৃষ্টি করেছে। নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের পরিবর্তে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করেছে। অপরাধ দমনের পরিবর্তে অপরাধ প্রবণতাকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এ অবস্থায় আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে হলেও ইসলামী আইন কার্যকর করা ছাড়া তা কোন দিনই সম্ভব নয়।

আমরা এখানে ইসলামী আইনের উৎস, বৈশিষ্ট্য, ক্রমবিকাশ ও প্রয়োগ পদ্ধতিকে পর্যায়ক্রমে পেশ করবো।

প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের উৎস

ইসলামী আইনের উৎস পেশ করার পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য দর্শনে রচিত আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানবীয় শক্তির ইচ্ছা অভিরুচি, অভ্যাসকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর ইসলামী জীবন দর্শনে আল্লাহ্‌র নির্দেশকেই আইনের প্রকৃত উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রচলিত রাষ্ট্রদর্শনে আইনের ৬টি উৎসকে গ্রহণ করা হয়েছে।

১. প্রচলিত প্রথা ঃ সমাজের দীর্ঘকালের প্রচলিত অভ্যাস ও প্রথাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে আইনের মর্যাদা দান করা হয়।

২. ধর্ম ঃ ধর্মীয় বিধানকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে আইনের মর্যাদা দান করা হয়।

৩. লিপিবদ্ধ আইনে কোন ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট বিধান না পাওয়া গেলে বিচারকগণ পূর্ববর্তী কোন বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ধরনের উৎস থেকে গৃহীত আইনকে বিচারক প্রণীত আইন বলা হয়।

৪. আইনবিদদের অভিমত ও বিচারকের রায় ঃ বিশিষ্ট আইনবিদদের সুদক্ষ আলোচনা ও সুচিন্তিত অভিমত অনেক সময় বিচারক কর্তৃক আইন হিসাবে গৃহীত হয়। অনেক সময় কয়েকজন আইনবিদদের সম্মিলিত অভিমতের আলোকে বিচারকগণ রায় প্রদান করেন। এ ধরনের ব্যাখ্যা ও রায় রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হলে তা আইনের মর্যাদা লাভ করে।

৫. ন্যায়-নীতিবোধ ঃ বিচারকের বিবেকপ্রসূত ন্যায় নীতিবোধও অনেক সময় আইনের মর্যাদা লাভ করে। বিচারালয়ে আনীত যে সকল মামলা মোকদ্দমা প্রচলিত

www.pathagar.com

আইনের বিচারের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন বিচারকগণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ন্যায়নীতির বুনিয়াদের রায় প্রদান করেন এবং সিদ্ধান্ত পরবর্তী পর্যায়ে আইনের মর্যাদা লাভ করে।

৬. আইন পরিষদ ঃ প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন পরিষদই আইনের প্রধান উৎস। জনগনের কল্যাণার্থে দেশের শাসন-শৃঙ্খলা জনগণ ও সরকারের কর্তব্য নির্ধারণ ও গোটা জীবনধারার নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন পরিষদে প্রস্তাবাকারে উত্থাপিত হয় এবং আইন পরিষদে তা সর্বসম্মতভাবে বা অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে গৃহীত হলে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা লাভ করে এবং তা সার্বজনীন আইনে পরিণত হয়।

ইসলামী জীবন দর্শনে আইনের উৎস

ইসলামী জীবন দর্শনে আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে ওহী। ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই হচ্ছেন সার্বভৌম শক্তির মালিক। মানুষ এ বিশ্বে তার খলীফা হিসেবে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী মহাপ্রভুর ইচ্ছাকে কার্যকরী করাই হচ্ছে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সমগ্র সৃষ্টির একচ্ছত্র অধিপতি, নিরংকুশ মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তাই একমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছা হবে আইনের একমাত্র নির্ভুল উৎস। এ কারণে ইসলাম আল্লাহ্র ওহীকেই আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর ওহী দু'ভাগে বিভক্ত, যে ওহীর ভাব ও ভাষা সব কিছুই আল্লাহ্র তরফ হতে এসেছে তা হচ্ছে وحى متلو অর্থাৎ কুরআন। আর যার লক্ষ্য ও ভাব আল্লাহ্র তরফ হতে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)তাঁর নিজের ভাষায় রূপদান করেছেন তা হচ্ছে وحى غير متلو অর্থাৎ সুন্নাহ্। তা হলে ইসলামী আইনের চিরন্তনী নির্ভুল উৎস হচ্ছে ২টি– আল্ কুরআন ও সুন্নাহ্। মানুষের জীবন অত্যন্ত ব্যাপক। এমনটি হওয়া বিত্রিত নয় যে, অনেক নব উদ্ভূত সমস্যা যার সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্তে খুঁজে না পাওয়া যেতে পারে, তাই কুরআন ও সুন্নাহ্ অনেক মূলনীতি পেশ করেছে। ইসলাম এক চিরন্তন গতিশীল জীবন ব্যবস্থা। এ অবস্থায় ইসলাম জীবনের এ সকল খুটিনাটি সমস্যার সমাধানও দিয়েছে। তাই বিশ্বনবী নবোদ্ভূত সমস্যার সমাধান কল্পে اجتهاد। বা গবেষণাকে ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ইসলামী আইনের উৎস হচ্ছে– ৩টি কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজ্তিহাদ।

এই ইজ্তিহাদ বা গবেষণালব্ধ সমাধানের ক্ষেত্রে যখন সাহাবায়ে কিরাম বা আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন অথবা গোটা উম্মত যদি ঐকমত্য পোষণ করে তবে তা হবে ইজমা (اجماع) ও ভিন্নমত পোষণ করলে তা হবে কিয়াস (قياس)।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে যদিও ইসলামী আইনের উৎস তিনটিই প্রমাণিত হয়। যথা– কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদ, কিন্তু বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে ইসলামী আইনের উৎস ৪টিই বলা যেতে পারে। ২টি হচ্ছে ওহীভিত্তিক– কুরআন ও সুন্নাহ্। আর ২টি হচ্ছে ইজ্‌তিহাদ ভিত্তিক ইজমা (اجماع) ও কিয়াস (قياس)। তাই এখন থেকে পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামী আইনের উৎস ৪টি বলেই উল্লেখ করবো– কুরআন, সুন্নাহ্, ইজ্‌মা ও কিয়াস।

এ পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে ইসলামী আইনের ৪টি উৎসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

মানুষ এ সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। এর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তাই মালিক ও মনিবের বিশাল রাজত্বে তারই হুকুম মুতাবিক জীবন যাপন করতে হবে। তাঁরই হুকুম মুতাবিক বিশ্বজগত পরিচালনার জন্য হযরত আদম (আ) থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত অগণিত নবী ও রাসূল ১১০ খানা সহিফা ও ৪ খানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। এর মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সর্বশেষ গ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন। রাসূলের যিন্দেগীতে ইসলামী সমাজ গড়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্ট ওহী আকারে আল-কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আইনের মূলনীতি সহকারে রাসূল (সা)-এর নিকট জিবরাঈল (আ)-এর মারফত অবতীর্ণ হয়েছে।

আর এ কুরআনের বিধানকে কার্যকরী করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আর এক ধরনের গোপন প্রত্যাদেশ এসেছে, যার নাম হচ্ছে সুন্নাহ্। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আইনের নির্ভুল উৎস হওয়ার ব্যাপারে রাসূলের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। আর রাসূলের যিন্দেগীতে দীন সম্পর্কীয় যত কথা তিনি বলেছেন, যত কাজ তিনি করেছেন, আর যত কথা ও কাজকে তিনি দীনের কাজ ও কথা হিসেবে অনুমোদন বা সমর্থন দিয়েছেন, তা যে আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতেই করেছেন এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

রাসূল নিজের প্রকৃতি অনুসারে কথা বলেন নি বরং আল্লাহ্‌র ওহীর বুনিয়াদেই কথা বলেছেন। আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ আল-কুরআনেই রয়েছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন অধ্যায়ের উল্লেখ ঃ

(١) اَنِ احْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلاَتَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ - (مائده - ٤٠)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার বুনিয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনা করুন; কারও বিবেকের অনুসরণ করবেন না।

(٢) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ مائده -٤٤)

যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে না তারা কাফির।

(٣) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ مائده -٤٥)

যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, তারা জালিম।

(٤) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَسِقُوْنَ ـ مائده -٤٧)

যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, তারা ফাসিক।

(٥) اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ ـ (القران)

তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা'ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করো না।

(٦) مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ـ (الاحزاب ٣٦)

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত প্রদানের পর কোন মু'মিন পুরুষ বা মহিলার এর বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নেই। – সূরা আহ্যাব ঃ ৩৬

(٧) فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرُ ـ (المؤمن -١٢)

হুকুম দেওয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা একমাত্র মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ তা'আলারই। – সূরা মু'মিন ঃ ১২

(٨) وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (مائده ـ ٥٠)

বিশ্বাসী জাতির জন্য আল্লাহ্ ছাড়া আর উত্তম হুকুমদাতা কে হতে পারে। – সূরা মায়িদা ঃ ৫০

(٩) وَعَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ ـ (موطا امام مالك)

www.pathagar.com

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন আমি তোমাদের ২টি নির্ভুল জগতের উৎস রেখে যাচ্ছি। যদ্দিন তোমরা দৃঢ়ভাবে এ দুটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে (তদ্দিন) তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কুরআন ও তদীয় রাসূলের সুন্নাহ্। – মুয়াত্তা ইমাম মালিক

কুরআন ও সুন্নাহ্তে আইনের নির্ভুল উৎস এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি আর উদ্ধৃতি পেশ করার প্রয়োজন নেই।

আল-কুরআনের সংজ্ঞা

এ পর্যায়ে আমরা আইনের প্রথম উৎস আল-কুরআনের সংজ্ঞা পেশ করছি। ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ আইন বিশারদগণ আল-কুরআনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বলেছেন ঃ

فالقران منزل على رسول الله صلى عليه وسلم منقول عنه نقلا متواترا بلاشبهة ـ وهو اسم للنظم والمعنى جميعا ـ (نور الانوار صفحه ١٠ـ٩)

—কুরআন হচ্ছে সেই ঐশী গ্রন্থ যা (লওহ মাহফুজ থেকে) আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ) মারফত মহানবী (সা)-এর নিকট অবতীর্ণ করেছেন এবং তা বহু সংখ্যক লোক সন্দেহাতীতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সংরক্ষণ করেছেন এবং ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত হয়ে আসছে এবং কুরআন প্রকৃতপক্ষে তার শব্দরাজি, অর্থ ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য সবকিছু নিয়েই কুরআন। নূরুল আনোয়ার ঃ ৯-১০

(ক) ইসলামী আইনবিদগণ ৪টি পদ্ধতির মাধ্যমে আল-কুরআনের উৎস থেকে আইন গ্রহণ করেছেন। যখন কুরআনের কোন সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে কোন আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার বুনিয়াদে যে আইন গ্রহণ করা হয়েছে তাকে বলা হয় ইবারাতুন নস (عبارة النص)।

(খ) যখন শব্দের পরিবর্তে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন আইন গ্রহণ করা হয়, ঐ পদ্ধতিকেই এশারাতুন নস্ (اشارة النص) বলা হয়।

(গ) অর্থ গ্রহণকালীন আভিধানিক অর্থকে গুরুত্ব দিয়ে সে আইন গ্রহণ করা হয়েছে, ঐ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে দালালাতুন্নস (دلالة النص)।

(ঘ) আর অর্থ গ্রহণ করতে যখন চিন্তা ও জ্ঞানের আলোকে আইন গ্রহণ করা হয়েছে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে ইকতেজাউন নস্ (اقتضاء النص)।

www.pathagar.com

সুন্নাহ্‌র সংজ্ঞা

ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সুন্নাহ্। ইসলামী আইনবিদগণ সুন্নাহ্‌র সংজ্ঞা পেশ করে বলেছেন ঃ

السنة تطلق على قول الرسول وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وافعالهم - (نور الانوار)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা-কাজ ও অনুমোদন এবং সাহাবায়ে কিরামদের কথা ও কার্যাবলীকে সুন্নাহ্ বলা হয়। সাধারণ প্রচলিত অর্থে সুন্নাহ্ বলতে শুধু বিশ্বনবী (সা)-এর কথা, কর্ম ও সমর্থনকেই বোঝায়।

বর্ণনার দিক থেকে সুন্নাহ তিন ধরনের ঃ মুতাওতির (متواتر), মশহূর (مشهور) এবং ওয়াহেদ বা আহাদ (واحد)।

১. বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী যে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যাদের বিশ্বস্ততার কারণে তাদের বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রকার দ্বিধা ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এমন ধরনের হাদীসকে মুতাওতির (متواتر) বলা হয়।

২. যে হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবাদের যুগে একজন ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তাবেয়ীনগণের ও তাবে-তাবেয়ীনদের যুগে এমনি বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক তা বর্ণিত হয়েছে, যাদের বিশ্বস্ততার কারণে তাদের বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে আর কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না, তাকে মশহূর (مشهور) বলা হয়।

৩. যে হাদীসের বর্ণনার মূল্যমান মুতাওতির ও মশহূরের সমপর্যায়ের নয় এবং যার বর্ণনার প্রথম দিকে বা মধ্যভাগে ও শেষ পর্যায়ে একজন বা দুইজন বর্ণনাকারী হতে একজন বর্ণনা করেছেন। তাকে ওয়াহেদ বা আহাদ (واحد) বলা হয়।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার যে কুরআনের অনুরূপ সুন্নাহকে ইসলামী জীবন দর্শন তথা ইসলামী আইনের (اسلامى شريعت) এর উৎস হিসেবে গ্রহণ করা না হলে ইসলামী জীবনধারার আনুগত্য করাই সম্ভব নয়। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন যে, এমন একদিন আসবে যখন কিছু লোক বলা শুরু করবে যে, আমরা কুরআনে যা পেয়েছি তাই মানুষের জন্য যথেষ্ট সাবধান কুরআন হালাল ও হারাম বলে ঘোষণা করেছে। তা যেমনি অনুসরণযোগ্য, ঠিক তেমনি আমি যা বৈধ ও অবৈধ বলে ঘোষণা করেছি, তাও তেমনি অনুসরণযোগ্য। —ইবনে মাজাহ্।

অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "এমন একদিন আসবে যখন লোকেরা সোফাসেটে হেলান দিয়ে বসে হাদীস অমান্য করার ঘোষণা দেবে, তোমরা কখনও তাদের অনুসরণ করো না। তারা আমার নিকট হতে দূরে এবং আমিও তাদের নিকট হতে দূরে। —ইবনে মাজাহ্

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করা না হলে কুরআনকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করার কোন পথ থাকে না। কারণ কুরআনে অনেক ক্ষেত্রে জীবনের বিভিন্ন আইনের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে এবং হাদীস তার কার্যকর করার ব্যাপক বিধান পেশ করেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নামায ও যাকাতের কথাই ধরা যেতে পারে। কুরআনে করীমে ৮২ বার اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এতদ্ভিন্ন সাত শত আয়াতে নামাযের উপর আলোচনা রয়েছে এবং বহু আয়াতে যাকাতের কথা বর্ণিত হয়েছে কিন্তু নামায আদায়ের বিস্তারিত বিবরণ ও বিভিন্ন দ্রব্য ও জীবের যাকাতের পরিমাণ একমাত্র সুন্নাহ্ মারফত জানা যায়। তাই কুরআনকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার সাথে সাথে সুন্নাহ্কে অবশ্যই আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

আইনগত মর্যাদার দিক থেকে রাসূল (সা)-এর জিন্দিগীকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) এমন কাজ যা হুযূর (সা) করেছেন এবং অপরকে করার জন্য তাকীদ করেছেন এবং কখনও পরিত্যাগ করেননি, ইসলামী শরীয়তে তাকে ওয়াজিব واجب বলা হয়ে থাকে।

(খ) কোন কাজ হুযূর (সা) করেছেন এবং অপরকে করার জন্য তাকীদ করেছেন। মাঝে মাঝে নিজে পরিত্যাগও করেছেন, আইনের পরিভাষায় একে বলা হয়ে থাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ (سنت مؤكده)।

(গ) কোন কোন কাজ হুযূর (সা) করেছেন কিন্তু অপরকে করার জন্য তাকীদ করেননি। শুধু ফযীলত বর্ণনা করেছেন। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় سنت زوائد বা মুস্তাহাব।

(ঘ) কোন কোন কাজ মানুষ হিসেবে ও আরবের বাসিন্দা হিসেবে হুযূর (সা) করেছেন। অপরকে করার জন্য তাকীদও করেননি, এবং ফযীলত বর্ণনাও করেননি। ইসলামী পরিভাষায় এর মর্যাদা সুন্নাত নয় বরং আদাত (عادت)। আদাতুন নবীর অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। তবে রাসূল (সা)-এর মুহব্বতে যদি কেউ অনুসরণ করে তবে তাকে বিদ্রূপ করা চলবে না, বরং রাসূল (সা)-এর মহব্বতে আদাতুন্নবীর অনুসরণ করা উত্তম বা افضل । ইসলামে সর্ববাদী সম্মত আইনের নির্ভুল উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ।

ইজমা ও কিয়াসের গুরুত্ব ও সংজ্ঞা

আইনের ৩য় ও ৪র্থ উৎস ইজমা ও কিয়াস সম্পর্কে কোন কোন মহল আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন, এবং তারা বলেন ওহী ছাড়া কোন মানুষের মতকে ইসলামী

www.pathagar.com

আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইজমা ও কিয়াসকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার নীতিও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বহির্ভূত নয়। কেননা ইজমা ও কিয়াস তথা ইজতিহাদকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার নীতিও কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاعْتَبِرُوْا يَا اُوْلِى الاَبْصَارِ ـ القران)

হে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ! তোমরা এসব ঘটনা থেকে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, "বৃহত্তম দলকে তোমরা অনুসরণ করো।"

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত মায়ায (রা)-কে ইয়ামেনের শাসক হিসেবে প্রেরণের সময় জিজ্ঞেস করলেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَ مَعَاذَ اِلَى الْيَمِيْنِ قَالَ بِمَا تَقْتَضِىْ يَا مَعَاذُ ؟ فَقَالَ بِكِتَابِ اللّٰهِ ـ قَالَ فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ ؟ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَّمْ تَّجِدْ ؟ قَالَ اَجْتَهِدُ بِرَائِىْ ـ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِهِ بِمَا يُرْضِى بِهِ رَسُوْلُهُ ـ (ابن ماجه)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মায়ায (রা)-কে ইয়ামেনে প্রেরণ কালীন জিজ্ঞেস করলেন, "হে মায়ায! কোন্ আইনের দ্বারা তুমি তথায় বিচার ফায়সালা করবে ?" তদুত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কিতাব'। রাসূল বললেন, "যদি তাতে না পাও ? তিনি বললেন, 'রাসূলের সুন্নাহ্।' রাসূল (সা) বললেন, যদি তাতে না পাও ? তিনি বললেন, আমি কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে নিজের বিবেক বুদ্ধিমত গবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌছাবো।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব শুনে বললেন, আমি সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা আদায় করছি যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন সিদ্ধান্তে পৌছার তওফিক দিয়েছেন যাতে আল্লাহ্‌র রাসূল সন্তুষ্ট হতে পারেন।

আরও অনেক হাদীস থেকে ইজতিহাদকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণের অনুমোদন পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এক গতিশীল চিরন্তন জীবন পদ্ধতি। আর মানুষের জীবনে অসংখ্য সমস্যার উদ্ভব হয় এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মূলনীতির বুনিয়াদে গবেষণার মাধ্যমে নবোদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইজতিহাদ আকাশ থেকে কোন দরজা দিয়ে অবতীর্ণ হয় না। তাই ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু তাই বলে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য মুক্ত ইজতিহাদের অধিকার উন্মুক্ত

www.pathagar.com

নয়। অতীতের চিন্তাবিদদের সমস্ত গবেষণাকে বাতিল করার জন্যইজতিহাদের প্রয়োজন নেই। নবীণ অজ্ঞদের গবেষণার চেয়ে প্রবীণ বিজ্ঞদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনেক কল্যাণকর। আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

زاجتہاد عالمان کم نظر

افتراء برر فتگاں محفوظ تر

চিন্তা ও দৃষ্টির অধিকারী এ যুগের অনভিজ্ঞ গবেষকের চেয়ে পুরাতন যুগের বিজ্ঞ পণ্ডিতদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত অনেক উত্তম।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য গবেষণারও ৩টি দিক রয়েছে ঃ

১. اجتهاد فى الدين কোন জীবনাদর্শ বা ধর্মসত্য এ নিয়ে গবেষণা করাকে ইজতিহাদ ফিদ্দীন বলা হয়; ইসলাম এ ধরনের কোন গবেষণার পথ উন্মুক্ত রাখেনি।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلَامِ (ال عمران)

আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দীন হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।

এ ঘোষণার পর কোন্ দীন সত্য ? এ ব্যাপারে গবেষণার আর কোন অবকাশ নেই।

২. اجتهاد فى المذاهب —বিভিন্ন আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের অভিমতের মধ্যে কোন্‌টি নির্ভুল এ ব্যাপারে গবেষণা করাকে ইজতিহাদ ফিল মাযাহিব বলা হয়, এক্ষেত্রে বিজ্ঞ ইমামদের উপর আস্থা রেখে অনুসরণ করার পন্থাই উত্তম, তবে কোন কোন ইমামের সিদ্ধান্ত যদি কিয়াসের বুনিয়াদে হয়ে থাকে, তবে তার খেলাফে কোন হাদীস পাওয়া গেলে হাদীসের অনুসরণ উত্তম, আর যদি ইমামের সিদ্ধান্ত কোন দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে হয়ে থাকে এবং এর বিপরীত কোন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায়, তবে এ ক্ষেত্রে সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ করাই উত্তম, যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন–

اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِى -

যখন আমার কথার বিপরীত কোন হাদীস পাওয়া যাবে তাকে আমার মাযহাব বলে ধরে নেবো।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন ঃ

اِذَا وَجَدْتَ الْحَدِيْثَ الصَّحِيْحَ خَلَافَ قَوْلِىْ فَاحِطْ قَوْلِىْ عَلَى الحَائِطِ

(رسائل ومسائل)

যখন আমার কথার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ হাদীস তুমি পাবে, তখন আমার কথাকে প্রাচীর গাত্রে ছুঁড়ে ফেলবে।

ইজতিহাদ ফিল মাযাহেবের আজকে তেমন কোন প্রয়োজন নেই।

৩. اجتهاد فى المسائل —মানব জীবনে নবোদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধানে গবেষণায় নিয়োজিত হওয়াকে বলা হয় ইজতিহাদ ফিল মাসায়েল এবং এ ধরনের গবেষণার দ্বার ততদিন উন্মুক্ত থাকবে, যতদিন ইসলাম দুনিয়ায় টিকে থাকবে, এর দ্বার বন্ধ করার মানে হলো ইসলামের গতিশীলতাকে রুদ্ধ করে দেওয়া। মানব জীবনের নবোদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্যই ইজতিহাদকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণা লব্ধ ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে আইনবিদ যখন ঐকমত্য পোষণ করেন, তাকে বলা হয় ইজমা। আর যখন আইনবিদগণ ভিন্নমত পোষণ করেন, তাকে বলা হয় কিয়াস। যেমন ইসলামী আইনের নীতিশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

غَيْرُ الْوَحِيِّ اِنْ كَانَ قَوْلُ اعْكَلِّ فَالاِجْمَاعُ وَاِلاَّ فَالْقِيَاسُ -

ইজমার সংজ্ঞা

কুরআন ও সুন্নাহ্ হতে এটি প্রমাণিত সত্য যে, ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজমা। ইজমার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে اتفاق বা ঐক্য। ইসলামী আইনশাস্ত্রের পরিভাষায় একই যুগের একনিষ্ঠ সৎ বিজ্ঞ মুজতাহিদদের শরীয়ত সংক্রান্ত কোন কাজ ও কথায় ঐকমত্য গ্রহণ করাকেই ইজমা বলা হয়।

اَلاِجْمَاعُ فِي اللُّغَاتِ الاِتِّفَاقُ وَفِي الشَّرِيْعَةِ اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْنَ الصَّالِحِيْنَ فِيْ عَصْرٍ وَّاحِدٍ عَلَى اَمْرٍ قَوْلِيْ اَوْفِعْلِيْ (نور الانوار صـ ٢٢٣)

এ প্রসঙ্গে এ কথাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইজমা বলতে মিল্লাতে মুসলিমের ইজমাকেই বুঝায়। ইজমার সিদ্ধান্তে ইসলামী-জীবন দর্শনে ইলমে ইয়াকীন হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে এবং ইজমা বলতে মূলত গোটা উম্মতের ইজমা, মদীনাবাসীদের ইজমা, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ইজমা, রাসূল (সা)-এর আওলাদের ইজমা, সমস্ত সাহাবায়ে মুজতাহিদীনের ইজমাকে বুঝায়।

কিয়াসের সংজ্ঞা

(قياس) কিয়াসের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—তুলনামূলকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা একটা দেখে আর একটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করা। অন্য অর্থে নিয়ন্ত্রিত করা। আর

www.pathagar.com

ইসলামী আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় মূল বিষয়ের সাথে তুলনা করে শাখা প্রশাখা বা অনুরূপ কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকেই কিয়াস বলা হয়। আর সাধারণ প্রচলিত অর্থে মানুষের জীবনের কোন সমস্যার ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণা করে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কোন বিশেষ বিধানের উপর তুলনা করে অপর কোন নবোদ্ভূত সমস্যার ব্যাপারে শরীয়তের শর্তানুসারে ইজতিহাদের পর যখন মুজতাহিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন, এ ধরনের সিদ্ধান্তকে কিয়াসের উৎস থেকে গৃহীত আইন বল হয়। কিয়াসকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ মূলত সুন্নাহ্ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। মহানবী (সা) সাহাবীদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি দিয়ে বলেছেন "যদি তুমি গবেষণার মাধ্যমে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, তবুও তুমি গবেষণার পরিশ্রমের এক সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হও, তবে তুমি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে।"

ইসলামের আইনের উৎস হিসেবে ইজতিহাদকে গ্রহণ ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা নির্ধারিত কোন আইনকে ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তন করার ইখতিয়ার কারও নেই। কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে যে সব সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, একমাত্র আইনের সে সব ক্ষেত্রেই ইজমা ও কিয়াসকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী আইনের উৎস সম্পর্কে জানার পর এ পর্যায়ে আমরা ইসলামী আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোই লিপিবদ্ধ করছি।

মানব রচিত আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যে বৈশিষ্ট্য ইসলামী আইনে রয়েছে তা মানব রচিত আইনে কখনও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না।

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব

১. ইসলামী আইনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, মানব রচিত আইনে মানবীয় সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। মানব রচিত আইন তা রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র যে তন্ত্রই হোক না কেন, এতে মানুষকেই সার্বভৌম শক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কখনও রাজা কখনও প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারম্যান, কখনও আইন পরিষদ, কখনও জনগণ আবার কখনও প্রধানমন্ত্রী কখনও কোন বিশেষ সংগঠনের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ আইন কোন মানুষকেই সার্বভৌম শক্তি হিসেবে স্বীকার করে না। ইসলাম চূড়ান্তভাবে একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনকেই সার্বভৌম শক্তি বলে ঘোষণা

www.pathagar.com

দিয়েছে। মানুষ মরণশীল, মানুষ সসীম, মানুষের জীবন ভুল-ভ্রান্তিতে গড়া মানুষ সৃষ্টি জগতের কোন কিছুর উপরই সর্বময় কর্তৃত্বের দাবি করতে পারে না। তাই যুক্তির কষ্টিপাথরেও মানবীয় সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

২. ইসলামী আইনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ আইন চিরন্তন, কালজয়ী ও অপরিবর্তনশীল। মানব রচিত আইন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণের মানুষের ইচ্ছা অনুসারে বারংবার পরিবর্তিত হতে থাকে। অপর পক্ষে ইসলামী আইনকে মানুষের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করা যায় না। ইসলামী আইনের মূল উৎস যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং এর বুনিয়াদ হচ্ছে ওহী, সুতরাং চিরঞ্জীব, অসীম জ্ঞানময়, নির্ভুল, সর্বময়-কর্তৃত্ব ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধনের ইখতিয়ার রাজা, প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্ট বা জনগণের নেই। বরং আল্লাহ্র খলীফা হিসেবে সব কালে সব যুগে সব দেশে একমাত্র আল্লাহ্র আইন কার্যকরী করাই হচ্ছে মানুষের প্রধানতম দায়িত্ব। আজকাল অনেকের মুখেই ইসলামকে যুগোপযোগী করার কথা শুনা যায়, প্রকৃতপক্ষে এর চেয়ে হাস্যকর অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক কথা আর কিছুই হতে পারে না। যে জনগোষ্ঠী ইসলামকে নিজেদের জীবন-দর্শন হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা ইসলামকে যুগের দাসে পরিণত করার দায়িত্ব পালন করবে না। বরং যুগকেই ইসলামের দাবি অনুসারে গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করবে। সভ্যতার স্রষ্টা যুগ নয় সভ্যতার সৃষ্টি মানুষ। যুগ মানুষকে গড়ে তোলে না বরং মানুষই যুগকে গড়ে তোলে। ইসলাম গতিশীল বৈজ্ঞানিক জীবন-দর্শন। সকল যুগের প্রয়োজন পূরণ করার যোগ্যতা একমাত্র ইসলামী জীবন-দর্শনের মধ্যেই রয়েছে। যুগে যুগে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান যুগে যুগে আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানব-কল্যাণের জন্য ব্যবহারের চিরন্তন মূলনীতি একমাত্র ইসলামী মূল্যবোধের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাই ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, ইসলাম এক চিরন্তন ও কালজয়ী আদর্শ। কালের স্রোতে ভেসে যাওয়া ইসলামের কাজ নয়। কালকে ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গড়ে তোলাই হচ্ছে ইসলামের অন্যতম কাজ।

৩. পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি

ইসলামী আইনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি। মানুষের পূর্ণ জীবনের সামগ্রিক বিধি-বিধান ও তার মূল নীতি ইসলাম পেশ করেছে। মানব রচিত আইনের বিচার-বিশ্লেষণে এ সত্য একান্ত সুস্পষ্টভাবে ধরা দেবে যে, মানুষের চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে যে জীবন ধারা ও আইন রচিত হয়েছে তন্মধ্যে একই দার্শনিকের কাছে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন দার্শনিকদের চিন্তাধারা মতবাদ ও সমাধান সম্পর্কে লক্ষ্য

www.pathagar.com

করলে দেখা যাবে যে, কেউ শুধু রাজনৈতিক সমাধান দিয়েছেন। আবার কেউ শুধু অর্থনীতি নিয়েই চিন্তা ও গবেষণা করেছেন। আবার কেউ শুধু যৌন জীবনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমস্ত মতাদর্শের মধ্যে একমাত্র ইসলামই হচ্ছে এমন জীবন ধারা যা মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের সমাধান পেশ করেছে। আসলে কোন মানুষ তা ব্যক্তিই হোক আর সমষ্টি হোক বা সংগঠনই হোক না, মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের সম্যক উপলব্ধি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মানব রচিত মতাদর্শ মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের সমাধান দিতে পারে না।

৪. অসীম কল্যাণকর ও নির্ভুল

ইসলামী আইনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলামী আইন অসীম, কল্যাণময় ও নির্ভুল। ইসলামী আইনের মূল উৎস ওহী। আর ওহী বা প্রজ্ঞা একমাত্র আল্লাহ্‌র তরফ হতেই অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ অসীম ও তাঁর নির্ভুল জ্ঞানের পরিধি সীমিত নয়। তাই অসীমের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীভিত্তিক ইসলামী আইনই একমাত্র মানুষের নির্ভুল ব্যবস্থা ও অসীম কল্যাণের বিধান দিতে পারে।

৫. সার্বজনীন

ইসলামী আইনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এ আইন সার্বজনীন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেহেতু সমগ্র সৃষ্টির মালিক, মনিব, স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, সমস্ত মাখলুকাতের তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি, সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণ-অকল্যাণ তাঁর চেয়ে বেশি কারো জ্ঞাত নয়। তিনি যুগ, কাল ও ভৌগলিক সীমার ঊর্ধ্বে। তাঁর প্রদত্ত আইনই একমাত্র সার্বজনীন আইনের মর্যাদা পেতে পারে। মানব রচিত কোন আইন প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

৬. নিরপেক্ষ ও উদার

ইসলামী আইনের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, এ আইন নিরপেক্ষ এবং উদার। আল্লাহ্ তা'আলার প্রাকৃতিক অনুগ্রহ যেমনি সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করেছেন এবং তার রচিত আইন সকল জাতি সকল মানুষের জন্য সমভাবে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে, কোন গোষ্ঠী বা অঞ্চল বা জাতির [illegible] বিদ্বেষপ্রসূত মানসিকতার ফলশ্রুতি এ বিধান নয়। তাই এ আইন সমস্ত সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত। এ কারণেই কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বুনিয়াদে রচিত ইসলামী আইনই হচ্ছে একমাত্র নিরপেক্ষ ও উদার আইন।

ইসলামী আইনের সংজ্ঞা, উৎস ও বৈশিষ্ট্য জ্ঞানলাভের পর ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের উপর আমাদের জ্ঞান অর্জনও অপরিহার্য।

www.pathagar.com

ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ্ প্রদত্ত চিরন্তন জীবন বিধান। আম্বিয়ায়ে কিরামগণের প্রতিষ্ঠিত দীন হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের আবির্ভাব শুধু ৬ষ্ঠ শতকেই ঘটেনি। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা), সমস্ত যুগের নবী ও রাসূলগণ তওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের বিশ্বাসের বুনিয়াদে ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়িত করেছেন। তবে ক্রমবিকাশের ধারানুসারে মহানবী (সা)-এর মাধ্যমে এ পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ব্যবস্থাকে মানবগোষ্ঠীর জন্য একমাত্র অনুসরণযোগ্য মুক্তির আদর্শ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় পর্যায়ক্রমে কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলো তেইশ বছরের নবুওতের জিন্দিগীতে অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক ও ইসলামী আইনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মহানবী (সা) জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করেন এবং আল্লাহ্র ওহী অনুসারেই তা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় পর্যন্ত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ হয়নি, তবে হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক তা বর্তমান তারতীব অনুসারে অনেক হাফিজের নিকট মুখস্ত আকারে রক্ষিত ছিল। মুসায়লামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফিজ শহীদ হলে, কুরআন করীম গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালেই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ গ্রন্থ হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর হযরত উমর (রা)-এর নিকট রক্ষিত ছিল। অতঃপর হযরত উসমান (রা)-এর আমলে এর বিপুল সংখ্যক কপি প্রস্তুত করে বিভিন্ন মুসলিম অঙ্গরাজ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ পর্যন্ত কিছু কিছু হাদীস বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট লিখিত ছিল। কিন্তু হাদীস তখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সাহাবাদের স্মৃতিতে রক্ষিত হাদীসের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হতো এবং কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী আইন কার্যকর করা হতো। উমাইয়া যুগে সর্বপ্রথম হাদীস লিখিতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ইমাম মালিক (র) মুয়াত্তা নামে এক বড় হাদীসগ্রন্থ রচনা করেন। সিহাহ্ সিত্তাহ্ প্রকাশের আগ পর্যন্ত মুয়াত্তাই ছিল সবচেয়ে প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন মুহাদ্দিস অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে বহু হাদীস গ্রন্থ যার মধ্যে সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সূনানে নাসায়ী, সূনানে আবূ দাউদ, সূনানে তিরমিযী ও সূনানে ইবনে মাজাহ্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

উপরোক্ত ছয়খানা গ্রন্থকেই সিহাহ্ সিত্তা বলা হয়। এছাড়া মুসনাদে ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে ইমাম আজম, বায়হাকী, হাকেম, মুস্তাদরেক, শরহে সুন্নাহ, শরহে মায়ানিয়ল আসার হাদীস শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন যুগে যুগে হাদীস শাস্ত্রের উপর বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রমাণের ভিত্তিতে পরবর্তী স্তরে ইসলামী আইন গ্রন্থও প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। ইমাম মালিক (র)-এর যুগে সর্বপ্রথম একাজ শুরু হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যুগে ইসলামী আইন-গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

আইনের বিভিন্ন শাখার উপর মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র) ও ইমাম যুফার (র) এ ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেদমত আঞ্জাম দেন। ইমাম শাফেয়ী (র) ও তাঁর অনুসারিগণ এ ব্যাপারে অনেক কাজ করেছেন।

ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশে ও পরিপূর্ণ আইনের রূপদানের ক্ষেত্রে হযরত ইমাম আবূ হানীফা, হযরত ইমাম মালিক, হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও হযরত ইমাম শাফেয়ী (র)-এর নামই শীর্ষস্থানীয়। ইমাম চতুষ্টয়ের অনুসারিগণ আইন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন। এক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়েম ও উপমহাদেশে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর খেদমত অবিস্মরণীয়।

উমাইয়া যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রখ্যাত আইনবিদগণ ইসলামী আইনকে সুবিন্যস্তভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। ইসলামী আইন বিষয়ক এসব গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে 'বাহ্রুর রায়েক, দুররুল মুখতার, নাইনুল আওতার, শামী, আলমগীরী, কাজী খান, হিদায়া, শরহে বেকায়া, কান্যুদ্ দাকায়েক, মনিয়াতুল মুসাল্লী আল ফিকাহ্ আলা মাযাহিবিল আরবায়াহ্, জামেউস্ সগীর, জামে কবীর, শরহে মায়াযউল আসার, ফিক্হুস্ সুন্নাহ্ মুনতাকা ইত্যাদি।

ইসলামী আইন বাস্তবায়নে সমস্যা

উপসংহারে আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আইনের বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু প্রস্তাবনা রেখেই এ নিবন্ধ সমাপ্ত করছি ঃ

১. অজ্ঞতা দূরীকরণ

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা আমরা নিজেরাই। সারা বিশ্বে একশ কোটির উর্ধ্বে মুসলমান রয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন প্রয়োগের ব্যাপারে আমরা মুসলমানরাই ঐক্যবদ্ধ নই এবং এ অনৈক্যের মূল কারণ হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। অজ্ঞতার চেয়ে বড় দুশমন অজ্ঞতার চেয়ে বড় অভিশাপ আর কিছুই হতে পারে না। আজকের মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে ইসলামী আইন প্রয়োগের বিরোধিতা করে থাকেন। এসব লোকদের মতে ইসলাম কোন রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন নয়। বরং একটি ব্যক্তিগত ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানগণ যতক্ষণ পর্যন্ত সচেতনভাবে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন হিসেবে উপলব্ধি না করবে যতদিন পর্যন্ত একটি রাষ্ট্র দর্শন হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ না করবে ততদিন পর্যন্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর ইসলামী আইন প্রয়োগ সম্ভব নয়।

এ জন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রথম দায়িত্ব হবে মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। অজ্ঞতা দূর করে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করাই হচ্ছে মুসলিম জাহানে আজকের সবচেয়ে প্রয়োজন। এ পথেই ইসলামী আইন প্রয়োগের বাস্তব পথ উন্মুক্ত হতে পারে।

২. ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা

ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ও প্রয়োগের দ্বিতীয় বাস্তব পন্থা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য। আদর্শগত ঐক্য স্থাপনে মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক ও জনগণ যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তবে ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন সংকটই থাকতে পারে না। বরং মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করলে বর্তমান বিবদমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মুসলিম বিশ্ব এক উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টি করতে পারে।

৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন সংস্থা

ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তৃতীয় বাস্তব পন্থা হচ্ছে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বিশিষ্ট ইসলামী আইনবিদগণের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কায়েম করা। এ সংস্থা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ইসলামী আইন কার্যকরী করণ সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ ও পরিকল্পনা দান করবে। বর্তমান প্রতিষ্ঠিত রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর একটি শাখা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সংস্থা গঠিত হতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্তমান বিশ্ব ঃ ইসলামী আইন

অসংখ্য প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আসমান ও যমীনের সমস্ত সম্পদ ও শক্তিকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করে আম্বিয়ায়ে কিরাম মারফত তাদের হিদায়তের জন্য নিখুঁত, নির্ভুল ও চির-কল্যাণকর জীবন-বিধান ও আইন পেশ করেছেন।

দরূদ ও সালাম তামাম আম্বিয়ায়ে কিরাম ও খাস করে আখেরী নবী সরওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি, যিনি মানব জাতিকে মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত মতবাদের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র দেয়া আইনের বুনিয়াদে পুনর্গঠিত করেছেন। যিনি মিথ্যা মা'বুদের পেশকৃত ব্যবস্থাকে পরাজিত ও পরাভূত করে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গোটা বিশ্ব যখন মানব রচিত আইনের অক্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে চরম অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে; মানুষ যখন বিভিন্ন মতবাদের স্টীমরোলারে চরমভাবে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে; দুনিয়ার চিন্তাশীল দার্শনিকগণ যখন মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এক চির-কল্যাণকর আদর্শের সন্ধানে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত, নতুন নতুন মত গজিয়ে উঠা প্রাচ্য প্রতীচ্যের ধ্বংসাত্মক মতবাদের দাবানলের তীব্র শিখা মানবতাকে পুড়িয়ে ছারখার করে চলেছে; এমনি যুগ সন্ধিক্ষণে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার এক বাস্তব উদ্যোগ হিসেবে এই ইসলামী আইনের রূপরেখা বিন্যাসের প্রয়াস।

বর্তমান বিশ্ব

'বর্তমান বিশ্ব ও ইসলামী আইনের' সম্যক পরিচিতি তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। তাই সর্বপ্রথমে বর্তমান বিশ্বের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ প্রয়োজন। বর্তমান বলতে এখানে কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিট বা বছরকে বুঝানো হয়নি, বরং বর্তমান বলতে বর্তমান শতাব্দীকেই বুঝানো হয়েছে। আর বিশ্ব বলতে গোটা পৃথিবীকে বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্ব প্রাচীন বিশ্ব বলতে আলাদা কোন বস্তুকে বুঝায় না, প্রাচীন বিশ্ব ও বর্তমান বিশ্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতীতে

www.pathagar.com

পৃথিবীতে যে নিয়মে বায়ু প্রবাহিত ছিল, বৃষ্টি বর্ষণ হতো, গাছপালা উৎপাদিত ও দিনরাতের পরিবর্তন হতো, বর্তমান বিশ্বে সে শাশ্বত নিয়মই রয়েছে। আদিকাল থেকে মানব সৃষ্টির যে নিয়ম ছিল আজও এখনও তাই, এর কোন পরিবর্তন নেই। তবুও বর্তমান বিশ্ব শব্দটির একটি আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। প্রাচীন বিশ্বে মানুষ ঢাল-তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করতো, আজকের বিশ্বে হাইড্রোজেন, এটমবোম, মেশিনগান, আর স্টেনগান দিয়ে যুদ্ধ চলে। বর্তমানে আরো মারাত্মক অস্ত্র তৈরির অশুভ প্রতিযোগিতা চলছে। আগের বিশ্বে এক গ্রামের এক অংশে দুর্ঘটনা ঘটলে গ্রামাঞ্চলে মানুষ সহজে তা জানতে পারত না, আজকের বিশ্বের এক প্রান্তে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তা অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন বিশ্বের লোকচক্ষুতে যে সব মহিলা নেচে গেয়ে বেড়াতো তাদেরকে নটী বলে আখ্যায়িত করতো, আজকের বস্তুবাদী দর্শনে বিভ্রান্ত লোকেরা তাদেরকে শিল্পী ও তারকা বলে আখ্যায়িত করে। আগের বিশ্বে নগ্নতা ও অর্ধনগ্নতাকে বর্বরতা ও পাশবিকতা বলে আখ্যায়িত করতো, আজকের রিশ্বে এটা সভ্যতা বা প্রকৃতির নিদর্শন বলে স্বীকৃত লাভ করেছে। বিবর্তনের হেরফেরে নৈতিকতা প্রশ্নে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীন বিশ্বে যারা ধার্মিক নীতিবান ছিলেন, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো, বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্য দর্শনের অনুসারীরা তাদেরকে অন্ধ বিশ্বাসী, প্রতিক্রিয়াশীল ও গোঁড়া বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্ব যান্ত্রিক উন্নয়নের যুগ হয়েও বিভিন্ন মতবাদ, হিংসা, বিদ্বেষ, মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা ও ব্যবহার বর্তমান পৃথিবীকে এক বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে, মানব জাতি হয়ে পড়েছে দিশেহারা। তাই আজকের বিশ্বে ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী আইন প্রয়োগযোগ্য কিনা ? ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধাগুলোই বা কি ? ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার সংকটই বা কোথায় ? এসব বিষয়ের উপরই আমাদেরকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

ইসলামী আইন

ইসলামী আইনের সংজ্ঞা পেশ করার পূর্বে আমাদেরকে প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে ইসলাম কি ? আজকের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার পূজারী ও বৈরাগ্যবাদীদের মতবাদ হচ্ছে—"ইসলাম একটি ধর্ম মাত্র"। ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতির কোন অস্তিত্ব নেই। এমনকি রাজনৈতিক দলের নেতা, সাহিত্যিক, কবি সাংবাদিকদের মধ্যেও এ ধরনের যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি রয়েছেন, যারা ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী নয়, মুসলিম জাতির মধ্যে এমন ধরনের লোক রয়েছেন, যারা ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এমন লোকেরা

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন হয়ে, ক্ষমতা ও প্রশাসন যন্ত্রের অপব্যবহারের মাধ্যমে ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন রাখার পন্থাও গ্রহণ করে থাকেন। ইসলাম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকলেও তারা মুসলমান হয়ে ইসলামকে শুধু ব্যক্তি জীবনের ধর্মমত বলে প্রচার করতে পারতেন না। মূলত ইসলাম মানব জাতির জন্য এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আল-কুরআন ও হাদীসে ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, ব্যবসায়-বাণিজ্য, যুদ্ধনীতি, আন্তর্জাতিক তথা জীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন এক অবিভাজ্য সত্তা। মানুষের বুনিয়াদে ইবাদতের নিয়ম কানুন কুরআন হাদীসে যেমন রয়েছে, তেমনি সমাজ, রাষ্ট্র, লেনদেন, বিচার, শাসন, শান্তি প্রভৃতি আইন বিধানের ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। ইবাদত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে ইসলাম কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেনি বরং পরিপূর্ণ জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার, প্রশাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ইসলাম নিছক কোন ব্যক্তি জীবনের ধর্মমত নয়, ইসলাম হচ্ছে গোটা মানব জীবনের জন্য এক সার্বজনীন চিরন্তন চিরকল্যাণকর, ভারসাম্যমূলক, সামঞ্জস্যশীল ও সুবিচারপূর্ণ জীবন বিধান।

ইবাদত, বন্দেগী, আকীদা, বিশ্বাস, কর্ম, লেনদেন, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন ব্যবস্থা, জনগণ ও সরকারের অধিকার ও কর্তব্য তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার নামই হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত বা আইন। ইসলামী আইনের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক ইজতিহাদলব্ধ ইজমা ও কিয়াস। আইন মানুষের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ, গণতন্ত্রের দ্বাররক্ষী, সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি। মুসলিম মিল্লাত হিসেবে মুসলমানদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবনকে আল্লাহ্র আইনের আনুগত্য করা। জীবনধারাকে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে গড়ে তোলা ও ইসলামী জীবনাদর্শকে বাস্তবায়িত করে সামগ্রিক জীবন থেকে ইসলাম বিরোধী ব্যবস্থাকে অপসারণ ও আল্লাহ্র বিধানকে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে তাদেরকে বাধাহীন অশ্বের মতো ছেড়ে দেননি। তাদের জীবনকে শাশ্বত হিদায়েতের বুনিয়াদে পরিচালনা করার জন্য যে ব্যবস্থা তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের ঈমানের বুনিয়াদে দিয়েছেন তাই হচ্ছে দীন। আর দীনকে পরিপূর্ণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে বিধি-বিধান ও ব্যবস্থা প্রদান করেছেন তাই হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত বা ইসলামী আইন। ইসলামী আইনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃসংকোচে দ্বিধাহীনচিত্তে নির্ভুল জীবন বিধান হিসেবে যারা কবূল করেন তাদেরকেই বলা হয় মুসলিম।

যে সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামী জীবনধারা তথা ইসলামী শরীয়ত ও আইনকে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করে পরিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী অনুশাসনকে

www.pathagar.com

মেনে চলে, তাকেই বলা হয় ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্রনীতি ও আইন ব্যবস্থার গুরুত্ব ও ইসলামী জীবন দর্শনের মৌল বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের সমষ্টিগত জীবন ধারাকে নির্ভুল আদর্শের বুনিয়াদে পরিচালনা করার হিদায়েতের ব্যবস্থা দিয়েছেন। হযরত আদম (আ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের সময় এ চিরন্তন ফরমান জারী করে পাঠানো হয়েছে—

"কুলনাহ্বিতু মিন্হা জামিয়ান্; ফাইম্মা ইয়া তিয়ান্নাকুম মিন্নী হুদান"। (সূরা বাকারা ৩৮ আয়াত)

"আমি বললাম, তোমরা আমার এ জান্নাত থেকে বেরিয়ে বিশাল যমীনে ছড়িয়ে পড়; অতঃপর অবশ্যই তোমাদের জীবন পরিচালনার জন্য আমার তরফ থেকে আসবে নির্ভুল হিদায়েত।"

ইসলামের এই হিদায়েতের উল্লেখ কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয় বরং গোটা মানব জাতির জন্য। প্রকৃতপক্ষে শুধু ব্যক্তির পেশকৃত কোন নীতিকে মানবতার নীতি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

মাতৃক্রোড় থেকে শিশুর বিচ্ছিন্নতার কল্পনা যেমনি অবান্তর ঠিক সমাজ জীবন থেকে ব্যক্তি জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাও তেমনি অসম্ভব। ইসলামের কোন বিধানই শুধু ব্যক্তিকে সম্বোধন করে অবতীর্ণ করা হয়নি। এমনকি বুনিয়াদী ঈমান ও ইবাদতের আহ্বান ও সমষ্টিকে ঘোষণা করে নাযিল করা হয়েছে। আল-কুরআনের বিধানকে সমষ্টিগতভাবে মেনে চলার ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"ইত্তাবিয়ূ মা উন্যিলা ইলাইকুম মির্রাব্বিকুম ওয়ালা তাত্তাবিয়ূ মিন দুনিহী আউলিয়া।"

যা তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে তার বিধান মেনে চলা ছাড়া অন্য কোন নেতার বা পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করো না। (আল-কুরআন)

আল-কুরআনের সমাজ দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যতিরেকে দুনিয়ার কোন সমাজ বিপ্লবীই সাফল্যের মঞ্জিলে পৌছাতে পারেনি। কোন আদর্শই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছাড়া কার্যকরী হতে পারে না। কুরআন ও সুন্নাহ্র অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে এবং বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক অপরাধের শাস্তির দীর্ঘ ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার কোন সামাজিক বিধি-বিধান বা শাস্তি ইত্যাদি শুধু শুধু মৌখিক উপদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত সামগ্রিক বিধি-বিধানকে সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অপরিহার্য। এজন্য আল্লাহ্র রাসূল (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে একটি আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম করে ইসলামী শরীয়ত বা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা মুসলমান হয়ে ইসলামের সাথে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার

www.pathagar.com

সম্পর্ককে অস্বীকার করে, একে দীনদারীর খেলাফ মনে করে, তারা প্রকৃপক্ষে মহানবী (সা)-এর উপস্থাপিত আদর্শের অনুসারী নয় এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে তারা ইসলামের অনুসারী নয়। যে ভূখণ্ডে মুসলমানরা বসবাস করে তথায় ইসলামী আইনকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাদের জন্য ফরয। সাহাবায়ে কিরাম এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দেহ মুবারক দাফন-কাফন করার পূর্বেই "সাকিফায়ে বানী সায়েদায়" একত্রিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের মহান দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। আকায়িদও এ কথা বলে যে, আল্লাহ্র পরিপূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির একমাত্র পথ। আল্লাহ্র পরিপূর্ণ দীন তথা ইসলামী আইন কোন ভূখণ্ডে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়। আহলে সুন্নাতুল জামা'আতের সর্ববাদী সম্মত প্রামাণ্য আকায়িদের গ্রন্থ 'শরহে আকায়েদে নসফীতে' লিখিত রয়েছে—

"আল্ ইজমাউ আলা হাযা আন্না নাসাবাল্ ইমামি ওয়াজিবুন আলাল উম্মাতি; লিআন্না জাসীরুম মিনাল ওয়াজিবাতি লায়াতাওয়াক্কাফু আলাইহি।"

ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত করা ওয়াজিব, এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেননা ইসলামী শরীয়তের অনেক ওয়াজিবের প্রতিষ্ঠা এরই উপর নির্ভর করে। (শরহে আকায়িদে নাসাফী, পৃঃ ১১০)

অর্থাৎ মুসলিম মিল্লাত আকায়িদের দিক থেকে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে যে, ইসলামী আইন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ফরয। উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ রয়েছে—কেননা ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব কায়েম ছাড়া চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, সামাজিক অপরাধ দমন এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্ধারিত শাস্তিমূলক বিধানগুলো সমাজে কার্যকর করা সম্ভব নয়। সমাজে শান্তিপ্রিয় সভ্য নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সম্ভব নয়। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, আকায়িদ ও উসূলে ফিকাহ্র গ্রন্থে ওয়াজিব শব্দটি ফরয অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন মানব মনে এই প্রত্যয়ই সৃষ্টি করে যে, ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোন অবকাশ নেই। ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা সতর্কতার সাথে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে ইসলামের দুশমনী করার মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কোন একনিষ্ঠ মুসলিমই রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারে না। যারা রাজনীতিহীন ইসলাম চর্চা করতে চান, তারা কুরআন ও সুন্নাহ্র ইসলামে বিশ্বাসী নয় বলেই প্রতীয়মান হয়। যে ইসলাম রাজনীতি থেকে মুক্ত তা কুরআন ও সুন্নাহ্র পেশকৃত আদর্শ থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত। আল-কুরআন মানুষের শুধু আধ্যাত্মিক জীবন দর্শন ও নিয়ম পদ্ধতি পেশ করেনি বরং পূর্ণ জীবনের পদ্ধতি ও মূলনীতি উপস্থাপিত করেছে।

www.pathagar.com

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা

ইসলামের দৃষ্টিতে ও বাস্তবতার আলোকে মানব জীবনকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করে দেখার কোন যৌক্তিকতা নেই। একজন মানুষ যেমনি দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মানুষ, ঠিক তেমনি মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ব্যবহারিক জীবন, উপাসনার জীবন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সবকিছু মিলিয়েই মানব জীবন। মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত জীবন পদ্ধতির নামই হচ্ছে ইসলাম।

মানুষের বুনিয়াদী ইবাদত, ব্যক্তি-জীবনের কর্মকাণ্ড, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উঠাবসা, চলাফেরা, শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিক চরিত্র, অর্থনৈতিক নিয়ম-কানুন, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, জীবন সম্পদ ও ইয্যতের নিরাপত্তা, বিবাহ–শাদী, উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও অর্থনীতি, প্রতিবেশী পরিবার ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার-অবিচার ইত্যাদি এমন কোন ক্ষেত্র ও পরিধি নেই, যে ব্যাপারে ইসলাম সঙ্গত-অসঙ্গত, বৈধ–অবৈধতার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেনি। মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে এই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ও বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। ইসলামী শরীয়ত আমাদের সুস্থ জীবন যাপনের পরিপূর্ণ যে নক্শা প্রদান করেছে, তার নাম হচ্ছে ইসলামী আইন। তাই এটা দ্বিধাহীনচিত্তে বলা চলে যে, ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যারা ইসলাম থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন এবং ইসলামে রাজনীতি আছে বললে উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তারা কুরআন ও সুন্নাহ্র ইসলাম সম্পর্কে কোন স্পষ্ট জ্ঞানই রাখেন না; তারা পাশ্চাত্য জগতের বস্তুবাদী রাজনীতি বিশারদ ও ইহুদী সন্তানদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন মতবাদ মানব রচিত সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সাহিত্য অধ্যয়ন করেই ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার অনধিকার চর্চা ও জাহেলী মতবাদ ব্যক্ত করেন। আল-কুরআনের সুস্পষ্ট দাবি হচ্ছে ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি।

"আলইয়াওমা আক্মালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্ মাম্তু আলাইকুম নি'মাতী ওয়া রাযীতু লাকুমুল ইস্লামা দীনা।"

"আজকের এই পবিত্র দিনে (৯ই জিলহজ্জ আরাফাতে) তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের জন্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে একমাত্র আদর্শ হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩)

www.pathagar.com

আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামীয়া।"

"আমি সকল মানুষের জন্যে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"*

(সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৫৮)

যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা মেনে নিতে চান না, তাদেরকে শুধু কয়েকটি বক্তৃতা শুনিয়ে দিলেই তাদের চিন্তাধারার পরিবর্তনের আশা করা যায় না। যদি সত্যিই তারা মুসলিম হিসেবে আত্মপরিচয় দিতে চান, আল্লাহ্র দরবারে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম হিসেবে ফিরে যেতে চান, তবে তাদের উচিত কুরআন ও হাদীস সরাসরি অধ্যয়ন করা। কুরআনে ফৌজদারী, দেওয়ানী, উত্তরাধিকারী, বিবাহ-শাদী এবং হাদীসে পূর্ণ জীবনের জন্যে রাসূল (সা)-এর জীবন থেকে যে কর্মধারা, ভাষা ও নিয়ম-কানুনের সমর্থনের বর্ণনা রয়েছে, গভীরভাবে তা অধ্যয়ন করা। মুক্ত ও সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন ও হাদীসের গভীর অধ্যয়ন, গবেষণা ও বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে ইসলামী জীবন পদ্ধতির এ প্রশস্ত রাজপথ তাদের কাছে উন্মুক্ত হতে পারে না। মানুষের পক্ষে হিদায়েতের আলোকময় পথকে উপলব্ধি করা ও গ্রহণ করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্ভুল জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ না করা হয়।

ইসলামী আইনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ

কুরআন সুন্নাহ্ ও ইজমা কিয়াসের বুনিয়াদে মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে যে সকল নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে, তাই হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত বা ইসলামী আইন। উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে ইসলাম প্রদত্ত গোটা জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে ঐশী আইন বা বিধান। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় এমন সব বিধি-বিধান, শাস্তি ও নিয়ম পদ্ধতিকে আইন বলে যা প্রতিষ্ঠার জন্যে রাষ্ট্রশক্তি বা রাজনৈতিক ক্ষমতা অপরিহার্য। আধুনিক রাষ্ট্রনীতিতে প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞার আলোকে আইনবেত্তাগণ তাকেই ইসলামী আইন বলে থাকেন যা প্রয়োগ ও কার্যকরী করার জন্যে ইসলামের ধ্যান-ধারণা, নিয়ম-নীতি ও বৈশিষ্ট্যের বুনিয়াদে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিধি-বিধান কার্যকর করা হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র

যে ভূখণ্ড ঐশী সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য, সরকার, জনগণ ও আল্লাহ্‌র আইন তথা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ নীতির বুনিয়াদে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা ব্যবস্থাকে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় ইসলামী রাষ্ট্র। শুধু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বা মুসলমান রাষ্ট্রনায়ক হলেই তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না, বড়জোর তা একটি মুসলিম রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ থাকে– যথা শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগ। তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাও উপরোক্ত বিভাগগুলো নিয়েই গঠিত হয়ে থাকে। হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেই আমরা দেখতে পাব, কিতাবুল হুদূদ, কিতাবুল ইমারত, কিতাবুল ক্বাযা আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ ; আল কুরআনের সূরা আন্ নিসা অধ্যয়ন করলে আমরা বিচার ও পারিবারিক ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন এবং বিভিন্ন বিভাগের সুস্পষ্ট বিধান দেখতে পাই। সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা ও সূরায়ে আন্‌ফালসহ বিভিন্ন সূরাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের সীমা, সরকার ও জনগনের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কীয় সুস্পষ্ট বিধানের সন্ধান পাই। এখানে পর্যায়ক্রমে আমরা ইসলামী আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করলাম।

(ক) শাসন বিভাগ

আমরা ইতিপূর্বেই জানতে পেরেছি যে, ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন অপরিহার্য। আর রাজতৈনিক সংগঠনের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শাসনতান্ত্রিক আইনের। ইসলাম শাসনতান্ত্রিক আইনের সকল প্রকার জরুরী মূলনীতিই নির্ধারিত করে দিয়েছে। পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে আইনসভা কায়েম। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ কি ? ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার জরুরী শর্তাবলীই বা কি ? সরকার এবং নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকারের সীমারেখা ও ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলমানদের অধিকার কি ? ইসলামী আইনের উৎস কোথায় ? প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা ও নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি কি ? শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংগঠনযোগ্য ব্যবস্থা কোন্‌গুলো ও শাসনতান্ত্রিক আইনের চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় অংশ কোন্‌গুলো ? এসকল ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বিধান দিয়েছে। আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে প্রশাসনিক আইন। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ্, নবুয়তের আদর্শ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমাদের সামনে উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে রয়েছে। রাষ্ট্রকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন এলাকায় বিভক্তকরণ,

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় পুলিশ বাহিনী, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার গুরুত্ব, সীমান্ত রক্ষা, রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়ের খাত, নাগরিকদের নৈতিক উন্নয়ন, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, নাগরিকদের বৈষয়িক কল্যাণের ব্যবস্থা গ্রহণ, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ–এ সকল ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট প্রশাসনিক আইন প্রদান করেছে। নিজস্ব ভূ-খণ্ডের ভিত্তিতে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ও আযাদী ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে। মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কোন ইখতিয়ার নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকার বা শক্তি কাউকে দেওয়া হয়নি।

(খ) বিচার বিভাগ

ইসলামী আইনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে– বিচার বিভাগ। এ ক্ষেত্রেও বিচার বিভাগের অধিকারের সীমা, বিচার পদ্ধতি, বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক অপরাধের শাস্তি ইত্যাদি ব্যাপারেও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট নীতি ও ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। আইনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথককরণ, বিচার বিভাগকে প্রশাসনিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার সুস্পষ্ট নীতিও দিয়েছে।

(গ) আইন বিভাগ

ইসলামী রাষ্ট্রের অপর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে আইন বিভাগ। আভ্যন্তরীণ আইন-কানুন ও সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে আইন বিভাগ অত্যন্ত জরুরী। ইসলামী আইনের চিরন্তন উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্। কুরআন ও সুন্নাহতে অধিকাংশ আইন লিপিবদ্ধ রয়েছে। এসকল আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন বিধিকে পরিবর্তন করার ইখতিয়ার কোন মানুষের নেই। কিন্তু আইনকে শ্রেণীবদ্ধভাবে শাসনতান্ত্রিক রূপদান ও কার্যকরী করার ব্যবস্থা নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরামর্শ প্রদান, রাষ্ট্রীয় সংকটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শ দান ও বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে আইনগত সিদ্ধান্তের জন্য আইন সভার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এজন্যে ইসলামী শরীয়তে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে 'মজলিসে শুরা' বা পরামর্শ সভা গঠনের গুরুত্ব কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত রয়েছে। এই মজলিসে শুরাই হচ্ছে আইন সভার বাস্তব রূপ। খুলাফায়ে রাশেদীনের মহান যুগে এ আইন সভা গঠনের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ইসলামী আইন কি এ যুগে সম্ভব ?

বর্তমান বিশ্বে শুধু, অমুসলিম দেশেই নয় মুসলিম দেশগুলোতেই যখন ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কথা ওঠে তখনই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, এ যুগে কি ইসলামী আইন

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা সম্ভব ? ষষ্ঠ শতাব্দীর পুরনো আইন কি বর্তমান যুগের চাহিদা মেটাতে পারে? হাজার বছরের প্রাচীন আইনকে বর্তমান বিশ্বের জন্যে গ্রহণযোগ্য মনে করা কি ঠিক হবে ? হাতকাটা ও প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করার মতো বর্বর ও নিষ্ঠুর আইন কি আজকেও চলতে পারে ? মুসলিম দেশগুলোতেও ইসলামী আইন চালু নেই। আবার মুসলমানদের অনেক ফির্কা রয়েছে, কোন ফির্কার আইন চালু করা হবে ? অমুসলিম নাগরিকদের উপর কিভাবে ইসলামী আইন চালু করা সম্ভব ? ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন ইসলামী আইনের বিপক্ষে বহু সুধী জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিও উত্থাপন করে থাকেন। এ পর্যায়ে আমাদের এ জাতীয় প্রশ্নের পর্যালোচনা ও তার একটি সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা দরকার। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এ প্রশ্নগুলো অনেক মুসলিম ব্যক্তির মুখেই শুনা যায়। অতীতেও দেখা গেছে অনেক আন্তর্জাতিক আইন সেমিনারে ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব, কল্যাণকারীতা ও বাস্তবতার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। আর কোন কোন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবেত্তা আইন পরিষদে দাঁড়িয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী আইন চালুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। এরা জেনে শুনেই যে ইসলামের দুশমনি করার নিয়তে এসব কথা বলে থাকেন, সকল ক্ষেত্রে তা বলা যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন বিশ্লেষণের অভাব, অজ্ঞতা, পাশ্চাত্য জীবন ধারার অনুসরণ, অনুকরণ ও মানসিক গোলামীতে লিপ্ত থাকার কারণেই এ ধরনের উক্তি করে থাকেন। ইসলামী আইন কি বর্তমানে চলতে পারে ? তাদের কাছে পাল্টা প্রশ্ন হচ্ছে– প্রশ্ন কি মুসলমানদের মুখ থেকে উচ্চারিত হতে পারে ? যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিত বলে দাবি করে, তার কাছ থেকে এসব প্রশ্ন আশাই করা যেতে পারে না। এ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণকারী কোন মুসলিমের মনে জাগতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্ন অন্য ধর্মাবলম্বীদের অথবা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে যারা বিশ্বাসী নয় তাদের মুখ থেকে বেরুলে তা হয়তো স্বাভাবিক মনে করা যেতে পারে। কিন্তু মুসলমান নামধারী ব্যক্তি এ ধরনের প্রশ্ন করে প্রকৃতপক্ষে তাদের অজ্ঞতার পরিচয়ই দিয়ে থাকে।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন মুসলমান তাদেরকেই বলা হয়, যারা আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে পরিপূর্ণ করে আত্মসমর্পণ করে। শুধু, আরবী ভাষার নাম মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট নয়। মুসলিম মিল্লাত বলতে সে জনগোষ্ঠীকেই বুঝায় যারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পেশকৃত পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে। ইসলামী মূল্যবোধ, জীবন ধারা ও আইন প্রয়োগযোগ্য নয় এ কথা মনে করা তো দূরের কথা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ যে ব্যক্তি করে, সে মুসলিম বলে দাবি করার ইখতিয়ারই রাখে না। এ পর্যায়ে আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

www.pathagar.com

"ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউ'মিনুনা হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম্ সুম্মা লা ইয়াজিদু ফী আন্‌ফুসিহিম্ হারাজাম মিম্মা কাযাইতা ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলীমা।"

আপনার রবের শপথ, ওরা ঈমানদার নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এমনকি পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের ব্যাপারেও বিচারক বা শাসক হিসেবে মেনে না নেয় এবং আপনার দেওয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করবে না ও পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করবে। (সূরা আন্‌নিসা ঃ ৬৫)

ইরশাদ হচ্ছে ঃ "ওয়ামা কানা লিমু'মিনিন্ ওয়ালা মু'মিনাতিন্ ইযা কাযিয়াল্লাহু ওয়া রসূলুহু, আমরান্ আন তাকুনা লাহুমুল খিয়ারাতু মিন্ আম্‌রিহিম।"

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন জীবনের কোন ফায়সালা দেন তখন নিজেদের ইচ্ছামত মেনে চলা ও না চলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার কোন মুসলিম পুরুষ ও মহিলার নেই। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৩৬)

আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ আইন অনুসারে যারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করে না কুরআনে তাদের জালিম, ফাসিক ও কাফির বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে –

"ফাহ্‌কুম্ বিনা আন্‌যালাল্লাহু ওয়ালা তাত্তাবি' আহ্‌ওয়াআহুম।"

হে রাসূল মানুষের মনগড়া ব্যবস্থার অনুসরণ না করে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করুন। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৮)

মুসলিম বলে পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের আইন অমান্য করার অধিকার কারো নেই, আল-কুরআনে আল্লাহ্‌র রাসূল ও উলিল আমরদের আনুগত্যের আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ হচ্ছে–

"ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ আতীয়ুল্লাহা ওয়া আতীয়ুর রাসূলা ওয়া উলিল আম্‌রি মিন্‌কুম।"

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো আর করো রাষ্ট্রনায়কদের। (সূরা আন্ নিসা ঃ ৫৯)

রাষ্ট্রনায়করা যদি আল্লাহ্‌র আইনের সীমালংঘন করে সমাজে আল্লাহ্‌র বিধানের পরিবর্তে নিজেদের ব্যবস্থা কায়েম করে তাদের আনুগত্য করো না।

"ওয়ালা তুতীয়ুল আম্‌রাল্ মুস্‌রিফীন।"

যারা আল্লাহ্‌র সীমালংঘন করে তাদের আনুগত্য করো না। –(সূরা শুয়ারা ঃ ১৫১)

"মান্ আমারাকুম বিমা'সিয়াতিন্ ফালা সাম্‌য়া ওয়ালা তায়াতা।" যারা তোমাদের আল্লাহ্‌র ও রাসূলের আনুগত্যহীনতার নির্দেশ দেয় তাদের কথা শুনো না, তাদের আনুগত্য করো না। (আল হাদীস)

www.pathagar.com

"লা তায়াস্তা লিমাখ্লূকিন্ ফী মা'সিয়াতিল খালিক।".

আল্লাহ্র আনুগত্যের বিরোধী কোন্ মাখলুকের আনুগত্য জায়েয নয়। (আল হাদীস)

প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে কোন মুসলমান ইসলামী আইনের বিরোধিতা করলে মুসলিম বলে দাবি করার ইখতিয়ার তার থাকে না। কোন মুসলিম যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের দেয়া আইনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, চোরের হাত কাটা, মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারের বেত্রদণ্ড এ যুগে চলতে পারে না বলে বিশ্বাস করে– তবে সে কাফির। আর সম্ভব বলে বিশ্বাস করে ও তার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে অথচ চালু করেন না, এ অবস্থায় তারা জালিম ও ফাসিক।

ইসলামী আইন কি এ যুগে চলতে পারে ? এ বলে যারা প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামী জীবনবিধান তথা ইসলামী আইনের মৌলিক বৈশিষ্টই হচ্ছে এ কোন কাল, যুগ, বর্ণ, ভূখণ্ড ও সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। বরং ইসলামী আইন হচ্ছে চিরন্তন কালজয়ী আদর্শ। ইসলামী বিধানের ৩টি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ

(১) এ বিধান পূর্ণাঙ্গ তথা পরিপূর্ণ বিধান, তার কোথাও বিন্দু পরিমাণ অসম্পূর্ণতা নেই। আইনের ক্ষেত্রে যেখানে যা প্রয়োজন তা পূরণ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ইসলামের রয়েছে। ইসলাম যুগের ভ্রান্ত দাবিকে পূরণ করে না বরং যুগকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আদর্শের বুনিয়াদে গড়ে তুলে। নতুন নতুন সমস্যার সমাধান ও এসবের প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা একমাত্র ইসলামের মধ্যে বিদ্যমান।

(২) ইসলামী আইন অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সক্ষম। সামাজিক দিক থেকে যতই উন্নতি বা প্রগতির পথে অগ্রসর হোক না কেন সে সম্পর্কে রক্ষা করার ক্ষমতা ইসলামী জীবন দর্শনে রয়েছে।

(৩) ইসলামী আইনের অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম কালজয়ী আদর্শ, কালের স্রোত যত দ্রুত অগ্রসর হোক, অতীত, বর্তমান সকল কালের চাহিদা পূর্ণ মাত্রায় মেটাবার মত ক্ষমতা ইসলামের বিধানে আছে। যারা ইসলামকে কালজয়ী আদর্শ ও আইন হিসেবে মেনে নিতে রাযী নন, তারা তাদের একথার সমর্থনে কুরআন-হাদীসের কোন প্রমাণই পেশ করতে পারবেন না, এমনকি এর সমর্থনে কোন গ্রহণযোগ্য বাস্তব যুক্তি তাদের কাছে নেই। মার্কসীয় দর্শন, বিবর্তনবাদ ও পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত বস্তুবাদ এবং পরবর্তী পর্যায়ে দর্শনের নামে তাদের ব্যক্তিগত মতবাদ বস্তুবাদের মুক্তিকেই এ দাবির সমর্থনে মোক্ষম যুক্তি হিসাবে পেশ করে থাকেন, কিন্তু এ মতবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিত ব্যক্তিরাই চিন্তা করে দেখে না যে, এ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রকৃতপক্ষে কোন যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক দর্শনই নয়।

www.pathagar.com

এর থিউরিটাই হচ্ছে এই যে, চিরন্তন সত্য বলতে কোন কিছুই নাই, কিন্তু বাস্তব যুক্তির আলোকে বিচার করে দেখুন মানুষের জীবনের জন্য কি কোন স্থায়ী মূল্যবোধ নেই ? সমাজের বাহ্যিক কাঠামোর মধ্যে যত বিবর্তনই সংঘটিত হোক না কেন তার স্থায়ী নিয়ম নীতির মধ্যে কি কোন পরিবর্তন হয়ে থাকে ? এমনটি শুধু মানুষের জীবনে মূল্যবোধের ব্যাপারেই নয়, প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সূচিত হয়েছে। এ সকল প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক ছাড়া কিছুতেই ইতিবাচক হতে পারে না। পুরাতন হওয়ার কারণেই কি কোন ব্যবস্থা অচল হয়ে গেছে ? আদিকাল থেকে যমীনে যে নিয়মে ফসল উৎপাদিত হয়ে আসছে, আজও তাই চালু রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আগে যা সত্য ছিল, আজও তা সত্য। আগেই ইসলাম বিশ্বমানবতার কল্যাণকর আদর্শ ও বিধান বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজও তা শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার একমাত্র কালজয়ী আইন বলে প্রমাণিত হবে। তাই যুক্তির নিরিখে এ প্রশ্নকে কোন গুরুত্ব দেওয়া চলে না। সে ইসলামী আইন কি এ যুগে সম্ভব ? আর পুরাতনের দোহাই দিয়েও ইসলামী আইনকে অপ্রয়োগযোগ্য প্রমাণ করা যেতে পারে না। কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে ঃ

"ওয়ালাম তাজিদা লিসুন্নাতিল্লাহি তাবদীলা।"

আল্লাহ্‌র নিয়মে কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না। (সূরা বনী ইস্‌রাঈল)

উহুদের যুদ্ধে হুযূর (সা)-এর শাহাদতের গুজব শুনার পর যে সকল সাহাবা হতোদ্যম হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, আল-কুরআনে তাঁদের সম্বোধন করে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"ওয়ামা মুহাম্মাদুন্ ইল্লা রাসূলুন্ ক্বাদ খালাত্ মিন্ ক্বাবলিহির-রোসূল, আফাইম্‌মাতা আও কুতিলা আন্‌কালাবতুম্ 'আলা আকাবিকুম।"

মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া আর কেউ নন, এবং আগেও বহু রাসূল চলে গেছেন, তিনি যতি ইন্তিকাল করেন অথবা শহীদ হন তাহলে তোমরা কি তাঁর আদর্শ থেকে পিঠ ফিরে উল্টো পথে যাবে ? (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪৪)

এই আয়াতেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত আইনকে চিরন্তন ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেওয়ার তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাস্তব যুক্তির আলোকে আরও প্রাণিধানযোগ্য যে, এ পৃথিবী বহু পুরাতন, এ সূর্য বহু পুরাতন, যারা পুরাতন হলেই সব অচল হয়ে যায় মনে করেন, তাদের এ পুরাতন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই,পুরাতন সূর্যের আলো গ্রহণের অধিকার নেই,পুরাতন পানি দিয়ে পিপাসা মেটাবার যৌক্তিকতাও নেই।

www.pathagar.com

ইসলামী আইনে বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সতর্কতা ও চাতুর্যের সাথে যে অভিযোগটি উথাপন করা হচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী আইনে হাতকাটা, পাথর মেরে হত্যা, বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। আজকের প্রগতিশীল বিশ্বে কি এত বড় নিষ্ঠুর আইন চালু হতে পারে ? তাই বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র যখন চোরের হাত কাটা ও ব্যভিচারীর উপর বেত্রদণ্ডের এবং রাস্তায় চুম্বনের কারণে বিপুল পরিমাণ অর্থদণ্ডের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন আমাদের দেশের কোন কোন সংবাদপত্রে বর্বর যুগের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বলে সম্পাদকীয় কলাম লেখা হয়। ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কথা শুনলেই অনেকে আঁতকে উঠে চিন্তা করতে থাকে এমন কোমল তুলতুলে পিঠে কি করে বেত্রদণ্ড গ্রহণ করবে। আর হাতের কতটুকু পর্যন্ত কাটা যাবে ? ইসলামী আইন প্রকৃতপক্ষে কোন বর্বর আইন নয় বরং এক সুবিচারপূর্ণ আইন। আল্লাহ্ তা'আলা রাহ্মানুর রাহীম, সুবিচারক। তাঁর দেয়া আইন বর্বরতা অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে না, কারণ সমষ্টির কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য যদি কোন ব্যক্তির কিছু ক্ষতি সাধিত হয় তবুও তাকে বর্বরতা বা নিষ্ঠুরতা বলা যেতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম বিল্ আদ্‌লি।" আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সুবিচারের হুকুম দিচ্ছেন। (আল-কুরআন)

আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ "ওইয হাকাম্‌তুম বাইনা আন্ তাহকুমূ বিল আদ্‌লি।" যখন লোকদের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব ও বিচারাসন অধিষ্ঠিত থাকে, তখন সুবিচারমূলক ফয়সালা কর। (সূরা আন্ নিসা ঃ ৫৮)

কুরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ "ওয়াফিল কিসাসি হায়াতুন্ ইয়া উলিল্ আলবাব্।" হে জ্ঞানী ব্যক্তিরা! আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হত্যা শাস্তির মধ্যেও রয়েছে জীবন। (আল কুরআন)

যে সভ্যতা ও প্রগতির ধ্বজধারীরা ইসলামী আইনকে বর্বর ও নিষ্ঠুর বলে অভিযোগ করেন, এ সকল পাশ্চাত্যের মানসিকতায় ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণকারীদেরকে কি প্রশ্ন করা যায় না ? যে বিশ্বের তথাকথিত সভ্যতা ও উদরতার দাবিদাররা শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে অপর জনগোষ্ঠীর আযাদী হরণ, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মানসে এটম বোমা হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করে। যারা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ৪ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে এবং তথাকথিত মুক্তির বিপ্লব পরিচালনার জন্য ২০ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। সে ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই ইসলামী আইনকে নিষ্ঠুর, বর্বর আইন বলে আখ্যায়িত করা যায় না।

www.pathagar.com

ইসলাম বিশ্ব কল্যাণের জন্য যে আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে আজকে বিশ্ব সভ্যতার দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও বিপক্ষ দলকে বা বিজিত দেশের সম্মানিত মানুষকে অনেক বেশি অপমানজনক ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থার দ্বারা নিজেদের পশু প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্তি করেছে। এখানে বিশ্ববিবেকের নীরব ক্রন্দন মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। এদের ব্যাকুল ফরিয়াদ আল্লাহ্র আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে। আল্লাহ্র দেওয়া সুবিচারমূলক আইনকে যারা গ্রহণ করতে চায় না, তাদের জীবনে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নেমে আসছে নানা বিপর্যয়, যা কখনও যুদ্ধের রূপ নিয়ে, কখনও ধ্বংসকারী বোমা হয়ে, কখনও বা বন্যা, ভূমিকম্পের রূপে বা মহামারি হয়ে।

আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মারণাস্ত্র নিজেরাই প্রস্তুত করছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান যাকাত, ফিৎরা, সদকা, দান খয়রাতের মাধ্যমে গণজীবনকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার মতো কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সম্মত যারা হয় না, তাদের জীবনে লুণ্ঠনের নিষ্ঠুর ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হবেই। তাদের নিজেদের বিবেকের নিকট যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে নিজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে ইসলামের বিধান অপেক্ষা অনেক বেশি নিষ্ঠুর ও বর্বর ব্যবস্থা বর্তমান শতাব্দীতে সভ্যতার লীলাভূমিতে প্রচলিত রয়েছে, যা তিলে তিলে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে তাদেরই মত এক দল মানুষ তাদের জীবনী শক্তিকে ধীরে ধীরে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। যারা আল্লাহ্র পৃথিবীতে কচি কিশোরদের মধুর হাসিতে ভরপুর করে তোলার চেয়ে তাদের সুকোমল প্রবৃত্তিগুলোকে বিকৃত করে তুলতে সাহায্য করছে। মুসলিম রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকা ও করার ফলে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এমনকি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ বলে থাকেন অনেক মুসলিম দেশেও যখন ইউরোপীয় ও আমেরিকা, রাশিয়া বা চীনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তখন ঐ সকল মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলাম বিরোধী আইন চালু থাকতে পারলে আমাদের দেশেও তা চালু থাকায় আপত্তি কোথায় ? এদের অজ্ঞতার জন্য সত্যই করুণার উদ্রেক হয়। অজ্ঞতা মানব সমাজের জন্য এক অভিশাপ এ অভিশাপ এমন নয় যে, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তবে এর চেয়ে আরও অভিশাপ হচ্ছে, অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন না হওয়া। এসব বন্ধুরা এমন আত্মচেতনাহীন অজ্ঞ যে, অজ্ঞতার উপলব্ধিটুকুও তাদের মধ্যে নেই। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই তাকে ইসলামী রাষ্ট্র মনে করা হয় এ ধরনের প্রমাণ অতীতে কোন কোন ঐতিহ্যবাহী মুসলিম খান্দানের অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পার্লামেন্ট পর্যন্ত উত্থাপন করেছেন।

দুঃখ হয় তাওহীদের শোণিত ধারা যাদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে তাদেরই জবান থেকে এমনি অদ্ভুত অভিনব কথা শুনলে। কোন হারাম দ্রব্য যিনিই পরিবেশন করুন

www.pathagar.com

না কেন তা হারামই থেকে যাবে, যদিও তা কোন বিদ্বান বা পরহিজগার ব্যক্তি পরিবেশন করেন। তেমনি যদি অনৈসলামী ব্যবস্থা অমুসলিম দেশে চালু থাকে তাকে অনৈসলামী ব্যবস্থাই বলা হয়, তেমনি তা মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক বা মুসলিম জনসংখ্যাগরিষ্ঠ অধ্যুষিত দেশে চালু থাকলেও তা অনৈসলামীত্ব ঘুচে যায় না এবং তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না। মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশকে মুসলিম রাষ্ট্র বলা চলে। এসব প্রখ্যাত পণ্ডিতরা মুসলিম রাষ্ট্র এবং ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যকার পার্থক্যটুকু না বুঝেই এ ধরনের অযৌক্তিক প্রমাণ উত্থাপন করে থাকেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ নয়, আজকের মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য তা যথেষ্ট নয়। এহেন মুসলিম দেশগুলোতেও কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আইন মুসলমানরা নিজেরাই চালু রেখে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে এও একান্ত হালকা ধরনের যুক্তি। এরা কখনও গভীর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি যে, মুসলিম দেশগুলোতে ইউরোপীয় আইন চালু থাকার প্রকৃত কারণ কি ?

১. দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে ইউরোপীয় আইন চালু থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে, ইতিহাসের সকল স্তরেই মানব সমাজ বিজয়ী জাতি, বিজয়ী সভ্যতা ও বিজয়ী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেনি। বিজয়ী জাতি আত্মম্ভরিতা ও পরাজিত জাতি হীনম্মন্যতার মারাত্মক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং এরই ফলে বিজয়ী সভ্যতার ধারকরা বিজিত জাতির উপর তাদের মতাদর্শ, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি আইন ও দর্শনকে চাপিয়ে দেয়। একটি স্বীকৃত নীতি রয়েছে–

"আন্নাসু আ'লা দীনি মুলুকিহিম।"

"জনগণ সাধারণত ক্ষমতাসীনদের নীতিকেই মেনে চলে।"

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্য দর্শন প্রায় সমগ্র বিশ্বে বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। দুনিয়ার সভ্যতার দাবিদার ছিল একমাত্র তারাই। ফলে মুসলিম দেশগুলোতেও পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামীর অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তা ও নৈতিক দুর্বলতার কারণেই ইউরোপীয় আইনকে নিজ নিজ দেশে চালু রেখেছে।

২. মুসলিম দেশগুলোতে ইসলাম বিরোধী আইন ও ব্যবস্থা চালু থাকার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মুসলিম সমাজ চিন্তা ও গবেষণার ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে মনে করে আস্‌হাবে কাহাফের মতো মহানিদ্রায় নিমজ্জিত। চিন্তা গবেষণার দুয়ারে তালাবদ্ধ করে ফের্কাবন্দী ও ফেরকী মতদ্বৈততায় ইসলামী আইন ও ব্যবস্থার প্রভাব ক্ষীণতর হতে থাকে এবং বিজাতীয় দর্শন ও সভ্যতার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্র চেতনার ও ইসলামী আইন প্রবর্তনের অভাবের তৃতীয় কারণ হচ্ছে, এক শ্রেণীর ধর্মীয় নেতা কর্তৃক ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।

www.pathagar.com

বৈরাগ্যবাদের প্রভাবিত ও বস্তুবাদী দর্শনে আস্থাশীল এ সকল বিভ্রান্তির বেড়াজালে আচ্ছন্ন ধর্মীয় নেতারা ইসলামী আইন ও রাষ্ট্রচেতনাকে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী নিছক রাজনৈতিক ব্যাপার বলে প্রচার করে ইসলামের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার সরাসরি বিরোধিতা করেও ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী সংসারত্যাগী সন্যাসবাদের প্রচার করার ফলে মুসলিম সমাজে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। তাদের মধ্যে সন্যাসবাদীরা এমনি ধারণার সৃষ্টি করে রেখেছে যে, আইন, শাসন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন গুরুত্ব ইসলামে নেই। শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু আচার অনুষ্ঠান মেনে চলাই মুক্তি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট। ভিন্নতর মতবাদ প্রচারণার চেয়ে মুসলমানদের এ ভ্রান্ত ধর্মীয় নেতাদের ইসলামের অপব্যাখ্যাই ইসলামী রাষ্ট্র ও আইন প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রচেষ্টাকে চরমভাবে ব্যাহত, প্রতিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

www.pathagar.com

ফকীহ্ ও ইমামদের মতভেদের অভিযোগ

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আইন চালু করা সম্ভব নয় বলে যারা মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করতে চায়, তাদের অভিযোগগুলোর মধ্যে এটিও বিশেষ আকর্ষণীয় ও চরমপ্রদ অভিযোগ যে, মুসলমানদের অনেক ফির্কা ও দল রয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যাপারে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে, ইসলামী আইন চালু করা হলে কোন ফের্কার মতে আইনকে কার্যকর করা হবে ? এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে অনেকে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে, এ সংকটের কি করে সমাধান করা যায়। এ জটিলতা থেকে কিভাবে অব্যাহতি লাভ করা যায়। গভীরভাবে অধ্যয়ন না করার দরূণ এ প্রশ্নটি অনেকের নিকট একান্ত জটিল বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি কোন সংকটই নয়। ইসলামী আইনে যে সকল বিষয়ে কোন মতভেদ না অতীতে ছিল, না বর্তমানে রয়েছে সেগুলো কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণের বুনিয়াদে গৃহীত হয়েছে।

ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক আইনের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যেও মতভেদ নেই বললেই চলে, মতভেদ যা রয়েছে শুধু ইজতিহাদ বা কিয়াসের বুনিয়াদে যেসব আইন রচিত হয়েছে তাতে। আর এসব সামান্য ব্যাপারে মতভেদকে ভিত্তি করে কোন কালেই ইসলামী আইন প্রয়োগযোগ্য নয় বা অচল এমন কথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কেউ উত্থাপন করেনি। খোলাফায়ে রাশেদীন সাহাবাদের যুগে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ ছিল। তখন কিন্তু কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেনি যে, যেহেতু মতভেদ রয়েছে সেহেতু এ আইন চালু করা যেতে পারে না। এই সেদিনও উপমহাদেশে মুসলমানদের বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইনকে ভিত্তি করেই পরিচালিত হয়েছে। মতভেদ তো একটি জীবন্ত জাতির লক্ষণ। মতভেদের কারণে একটি জাতি তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে পারে না। ফকীহদের মধ্যে যেসব ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে তা অস্পষ্ট নয়। বরং ফের্কার নিজস্ব ব্যবস্থা সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন জটিল সমস্যাই নয়। সামান্য পরিশ্রম করলেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

১. যেসব ব্যাপারে সমস্ত ফের্কা একমত সেগুলো সর্ববাদী সম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য, সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই।

২. এখন প্রশ্ন হলো মতভেদগুলোর কোন্ ব্যবস্থা দেশের সাধারণ আইন (Common Law)-এর মর্যাদা লাভ করবে। এর জবাব একান্ত সহজ। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যে মতকে গ্রহণ করেছে মানব সভ্যতার চিরন্তন নীতি ও গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

মূল্যবোধের আলোকে তাদের গৃহীত মতই দেশের সাধারণ আইনের মর্যাদা লাভ করবে।

৩. এখন রয়ে গেল ভিন্নমত পোষণকারীরা এ আইন মেনে চলবে কেন ? তাদেরও তো মতামত প্রকাশ ও গ্রহণের আজাদীকে স্বীকৃতি দিতে হবে। হ্যাঁ, এটি সত্য, তাদের নিজস্ব নীতির ভিত্তিতে তাদের বিচার ফয়সালা করতে হবে। একই বিচারকের পক্ষে এ রায় দেওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়, কেননা প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত ফিকাহ্ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাই বিচারক সংশ্লিষ্ট বিচারপ্রার্থী ও অপরাধীরা কোন্ মতের অনুসারী তা জেনে শুনেই তাদের নিয়ম অনুসারে তাদের ব্যাপারে রায় প্রদান করবে। এটা ব্যতীত এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফের্কার জন্য আলাদা বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থাও প্রয়োজনবোধে করা যেতে পারে। যুগ যুগ ধরে ইসলামী আইন মুসলিম সমাজে চালু ছিল, কোন সময়ই মতভেদের অভিযোগ উত্থাপন করে মুসলিম সমাজ ইসলামী আইনের আনুগত্যের পথ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে বিজাতীয় আইন ও শাসন ব্যবস্থার গোলামীর যুক্তিকে গ্রহণ করেনি।

www.pathagar.com

অমুসলিদের অধিকার সংরক্ষণের অভিযোগ

ইসলামী আইন চালু করা সম্ভব না হওয়ার পক্ষে সাধারণত আরেকটা যুক্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে, তা হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক বাস করে, তাদের উপর জোর করে ইসলামী আইন চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না। তাদের নিজস্ব ধর্মের বিপরীত অপর একটি ধর্মীয় আইনকে মেনে নিতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রনীতি ও ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার কারণে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়ে থাকে। মূলত ইসলামই মানুষকে সর্বপ্রথম উন্নত ও উদার রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দিয়েছে এবং আধুনিক আইনবিদগণও ইসলামের নিকট থেকে এ মূলনীতি শিখেছেন যে, মানব সমাজে রাষ্ট্রীয় আইন ও ব্যক্তিগত আইনের পার্থক্য রয়েছে। অমুসলিম নাগরিকদের তো কোনক্রমেই এ আশঙ্কা থাকা উচিত নয় যে, তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ইসলামের আইন চালু করে দেওয়া হবে। মূলত ইসলামই প্রথম এ সহনশীলতা ও সহ অবস্থান নীতি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়েছে।

রাষ্ট্রীয় আইনের আনুগত্যের পর মুসলিম নাগরিকগণ যদি ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তে লিপ্ত না হয় তবে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে তারা একজন মুসলিম নাগরিকের সমপর্যায়ের অধিকার ভোগ করবে, তাদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। এমনকি কোন মুসলমান অন্য ধর্মের উপাস্য দেব-দেবীর প্রতি কোন অশালীন উক্তি করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদেরকে আইনের আনুগত্য করে চলতে হবে। দুনিয়ার কোন ব্যবস্থাই কোন মানুষকে সে পর্যন্ত নাগরিকত্বের অধিকার প্রদান করে না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ রাষ্ট্রের আইনের আনুগত্য ও তার কল্যাণ কামনার প্রতিশ্রুতি না দেয়। কেহ কেহ বলে থাকেন, যদি ইসলামী আইন চালু করা হয় তবে অমুসলিম নাগরিকগণ আমাদের উপর খুশী হবে না। অমুক অমুক শক্তিশালী দেশ ও রাষ্ট্র আমাদের শত্রুতে পরিণত হবে, তারা আমাদেরকে খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে না, আমরা একঘরে হয়ে যাব। মূলত এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে ইসলামী আইনের বিপক্ষে কথা বলার কোন যৌক্তিকতা নেই। কেননা মুসলমান অপর কারও সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির বিচার করে জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। মুসলিম জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা রাসূলে খোদাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা এ হিদায়েত নাযিল করেছেন ঃ

"লান্ তারযা আন্‌কাল ইয়াহূদা ওয়ালান নাসারা হাত্তা তাত্তাবিয়া' মিল্লাতাহুম্।"(সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১২০)

www.pathagar.com

ইহুদী ও নাসারাগণ ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ব্যবস্থার অনুসরণ করেন।" অপর কোন রাষ্ট্র, জাতি ও সম্প্রদায়ের ভয়ে ভীত হয়ে ইসলামী আইনকে যারা গ্রহণ করে না তাদেরকে আল্ কুরআনে কাফির বলে খেতাব দেওয়া হয়েছে ঃ"ফালা তাখশাউন্নাসা ওয়াখ্ শাওনী ওয়ালা তাশতার্ বিআয়াতী ছামানান্ কালীলা, ওয়ামান্ লাম্ ইয়াহ্কুম বিমা আন্যালাল্লাহু, ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন।" (সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ৪৪)

"মানুষকে ভয় করো না, একমাত্র আমাকেই ভয় করো আর আমার আয়াতগুলোকে দুনিয়ার স্বার্থে বিক্রি (বিকৃত) করো না, যারা আমার অবতীর্ণ কিতাবের আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে না তারা কাফির।" এ আয়াত তদানিন্তন মুসলিম সমাজকে যেমনি গ্রীক, সিরিয়া, পারস্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চোখ রাঙানী ও ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে খোদায়ী আইনের আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছে, তেমনি আজকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে বিভিন্ন শক্তিশালী কিন্তু ভিন্ন আদর্শাবলম্বী হতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধিকে সামগ্রিক জীবন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছে। মুসলিম মিল্লাত কোনক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভ্রুকুটির সামনে সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও দাস প্রথা

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কথা উত্থাপিত হলেই একশ্রেণীর লোকেরা বলে থাকেন যে, ইসলামী আইন বুর্জোয়া সামন্তবাদী দাস প্রথাকে সমর্থন করে এমন মানবতা বিরোধী মান্ধাতার আমলের ব্যবস্থা আজকের উন্নত সমাজে কি করে চালু হতে পারে ? তারা বলে থাকেন, ইসলাম যদি সুবিচারমূলক ব্যবস্থা হয়ে থাকে মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ন্যায় আস্থাশীল আদর্শ হয় তাহলে ইসলামী আইনে দাস প্রথার অনুমোদন কি করে করা হলো ? আজকের নাস্তিক্যবাদের অনুসারীরা এ যুক্তি উত্থাপন করেই মুসলিম যুব সমাজের মন-মস্তিষ্ককে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ও অন্য মতবাদে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। তাদের প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে অনেক একনিষ্ঠ মুসলমানও মনে মনে চিন্তা করে, যে ইসলাম "ওয়ালাক্বাদ কার্‌রামনা বনী আদামা" বলে মানুষকে সম্মানের সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছে, সে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় দাস প্রথা কিভাবে অনুমোদন লাভ করলো ?

যারা ইসলামে দাস প্রথাকে অনুমোদন করেছে বলে প্রোপাগান্ডা করে থাকেন, তারা গভীরভাবে ইসলামকে অধ্যয়ন করেননি। অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবেই দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সে সত্যকে বিকৃত করে দেখেন। যে অবস্থা ও পরিবেশের কোন আয়াত, হাদীস ও ফিকাহ্ থেকে দাস প্রথার সমর্থন খুঁজে বের করা হয়, সে সময় দাস প্রথা থেকে দুনিয়ার মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কুরআন, হাদীস, রাসূল ও সাহাবা কিরামেরা কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, কি ধরনের বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা থেকে দুনিয়ার মানুষকে অজ্ঞ রেখেই এসব ইসলামের পরম শত্রুরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় রত।

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা ও মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন পৃথিবীতে আসেন, তখনকার পরিবেশ ও পটভূমিকে এসব তথাকথিত যুক্তিবাদীরা পর্দার অন্তরালে রেখেই মানব সমাজকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করার জন্য ভুল তথ্য পরিবেশন করেন।

রিসালতের যুগে তদানিন্তন পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিদ্বয় গ্রীক ও পারস্যে পর্যন্ত দাস প্রথা প্রচলিত ছিল, আরব উপমহাদেশ ও চীন প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দাস প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল, সভ্যতার দাবিদার গ্রীক ও পারস্যে পর্যন্ত দাসদেরকে জানোয়ারের ন্যায় দড়ি বেঁধে হেঁচড়ে টানা হতো, তামাশা দেখার জন্য দাসদেরকে পারস্পরিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে একজন দাস কর্তৃক অপর দাসের মর্মান্তিক মৃত্যুর দৃশ্য উপভোগ করে হাততালি দিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠতো।

www.pathagar.com

একজন দাসীর সাথে একাধিক ব্যক্তির যৌন সম্ভোগের দৃশ্য ঘটা করে দেখা হতো। এমনি এক জঘন্য পরিবেশে ইসলামই এক বিপ্লবী ঘোষণা দিল ঃ

"ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহ্সানাও ওয়া বিজিলক্বুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকীনি ওয়াল জারিল্ জুনূবী ওয়াস্ সাহিবিল জান্বি ওয়াবনিস্ সাবীলি ওয়ামা মালাকাত আয়মানুকুম।" (সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ৩৬)

"মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করো, আর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিছকিন, আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, মুসাফির ও তোমাদের দাস-দাসী সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করো।"

এখানে নতুন করে দাস-দাসী বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়নি বরং সমাজ-ব্যবস্থায় যারা আগে থেকে বিভিন্ন পরিবারে দাসী হিসাবে ছিল তাদেরকে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের সাথে সমাধকার ঘোষণা করে উত্তম ব্যবহারের বৈপ্লবিক ঘোষণা ইসলাম দিয়েছে। কোন স্বাধীন মহিলাকে জবরদস্তিমূলক দাসী বানানোর একটি ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং স্বাধীন মানুষকে জবরদস্তিমূলক অপহরণ করে দাস-দাসী হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় করাকে ইসলামে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"ওয়ামান লাম ইয়াস্ তাতি' মিন্কুম তওলান্ আন্ ইয়ানকিহাল মুহ্সিনাতিল মু'মিনাতি, ফামিম্মা মালাকাত আইমানুকুম্ মিন্ ফাতাইয়াতিকুমুল মু'মিনাতি; ওয়াল্লাহু আলামু, বিঈমানিকুম, বায়ুকুম মিন্বায্, ফান্কিহু হুন্না বিইয্নি আহ্লিহিন্না ওয়া আত্হুন্না উজুরাহুন্না।" (সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ২৫)

"তোমাদের মধ্যে যাদের অভিজাত মু'মিন মহিলাদেরকে বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তারা দাসীদেরকে তথা মু'মিন দাসীদেরকে বিয়ে কর। আল্লাহ্ তোমাদের ঈমানের অবস্থা ভাল করে জানেন। প্রকৃতপক্ষে তোমরা সকলেই এক বংশোদ্ভূত। কেউ কারো থেকে স্বতন্ত্র নও। তোমরা মু'মিন দাসীদেরকে তাদের প্রাপ্য মোহর দিয়ে তাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে কর।"

এখানে গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, তোমরা সকলেই এক বংশোদ্ভূত বলে তদানীন্তন সমাজে অবহেলিত দাস-দাসীদেরকে সমাজের সকলের সাথে একই মর্যাদার অধিকারিণী বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে মোহরানা আদায় করার নির্দেশ দিয়ে তাদের নারীত্বকে সমাজের অপর সকল নারীর সমমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

এ বিবাহের ঘোষণার দ্বারা সমমর্যাদার অধিকার দিয়ে, স্বাধীন মানুষের জীবন-সঙ্গীনীর অধিকার প্রদান করে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাদের সন্তানদেরকে স্বাধীন মানুষের সন্তানের সমপর্যায়ে উত্তরাধিকারী

www.pathagar.com

হওয়ার অধিকার ইসলাম ঘোষণা করেছে। এরপর কি করে বলা যেতে পারে ইসলাম দাস প্রথাকে সমর্থন করেছে ? তবুও উল্লেখ করা যায় যে, যারা ইসলামের দাস প্রথার উত্থাপন করেন, তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি একটু জ্ঞান-চক্ষুকে উন্মীলিত করুন, দেখুন যখন গ্রীক, পারস্য সারা দুনিয়ার সামন্তবাদী শক্তিসমূহ দাসের নামে লাখো মানুষের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল তখন ইসলামের মহানবী (সা), হযরত আবূ বকর (রা), ওমর (রা), ওসমান (রা) ও বিভিন্ন সাহাবী কত সংখ্যক গোলামকে নিজ অর্থে খরিদ করে মুক্তি দিয়েছেন তা আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

আল্-কুরআনে রোযার কাফ্ফারা, কছমের কাফ্ফারা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে মানুষকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করার কত প্রকার পন্থা সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন। এরপরও বিভিন্ন হাদীস, কুরআনের আয়াত ও ফিকাহ্র অধ্যায় থেকে দাস প্রথার যে সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় এর জবাবও খুব কঠিন নয়।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দাবিদার বিশ্বে যুদ্ধ-বন্দীদেরকে যুগের পর যুগ কারা প্রাচীরের অন্তরালে ধুকেধুকে মরার অমানুষিক প্রথা চালু করেছে ? অথবা সাইবেরীয়ার বাধ্যতামূলক শ্রম শিবিরে পাঠিয়ে বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনের মাধ্যমে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার বর্বর ব্যবস্থা চালু রেখেছে।

ইসলাম আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য যুদ্ধ বন্দীদেরকে সমজা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন না রেখে তাদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রের তরফ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা দিয়েছে। আর যদি মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্তির ব্যবস্থা বিলম্বিত হয় তবে তাদেরকে লৌহ যবনিকার অন্তরালে ঠেলে না দিয়ে অথবা শ্রম শিবিরে না পাঠিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন পরিবারে বণ্টন করে দিয়ে সমাজে শ্রমের বিনিময়ে মিশে যাওয়ার ব্যবস্থাই অনুমোদন করেছে। এ ধরনের মহিলাদেরকেও সম্পত্তির অধিকারিণী বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাদের সন্তানকে সাধারণভাবে উত্তরাধিকারী আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

নিজেরা যা খায়, যা পরে এ ধরনের শ্রমিকদেরকে তা খাওয়াবার ও পরিধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন স্বাধীন মানুষকে দাস করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও মানব রচিত আইনের মৌলিক পার্থক্য

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আইন চালু করার পক্ষে সর্বশেষ যুক্তি হচ্ছে এই যে, আজকের বিশ্ব অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যার স্তূপ বা 'অন্তহীন সমস্যার সমষ্টি' বললে অত্যুক্তি হবে না। সমগ্র বিশ্বের মানব আজ দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত। জুলুম, অত্যাচার ও অশান্তির দাবানলে তারা নিষ্পিষ্ট ও নির্যাতিত।

মানুষের মনগড়া বিভিন্ন মতবাদ, তথা বিবর্তনবাদ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ, নাস্তিক্যবাদী সমাজবাদ ইত্যাদি মতাদর্শের বাস্তবায়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু মরণশীল মানব-রচিত মতবাদ মানুষকে করেছে চরমভাবে বঞ্চিত। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় এ সকল মতবাদকে গ্রহণ করে মানুষ হয়েছে গোলামীর অকটোপাশে আবদ্ধ, এ সকল মতবাদ মানুষের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে মানুষকে করেছে অন্তহীন সমস্যার জিঞ্জিরে পরিবেষ্টিত।

ইসলাম মানুষকে দিয়েছে সত্যের সন্ধান। ইসলামকে গ্রহণ করেই মানুষ পেয়েছে শান্তি ও মুক্তির আস্বাদ। তাই আজও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বের সমস্যা বিজড়িত মানুষ মুক্তির আস্বাদ পেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানব রচিত আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। মানুষের গড়া আইন কোন দিন মানুষের জন্য প্রকৃত শান্তির বিধান প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, আজও পারবে না। এ পর্যায়ে আমরা মানব রচিত আইন ও ইসলামী আইনের মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরছি ঃ

১. মানব রচিত আইন তা রাজা বাদশাহ, ডিক্টেটর, পার্লামেন্ট বা গণভোট দ্বারা অথবা বহু প্রচলিত প্রথা বা বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত হোক না কেন তা মানুষের দ্বারাই রচিত। মানুষ তা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তি বা গুণীমণ্ডলী হোন না কেন তারা সকল অবস্থাতেই মানুষ। আর কোন মানুষই ভুল ভ্রান্তি, দুর্বলতা, বুদ্ধি-বিবেচনা সসীমতা, আভ্যন্তরীণ বা জৈবিক আকর্ষণ, সমসাময়িক যুগের প্রভাব ও ভাবাবেগ থেকে মুক্ত নয়। মানব রচিত আইন সম্পূর্ণ মানুষের বুদ্ধি ও বিদ্যার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। মানুষের অভিমত কখনও চিরন্তন হতে পারে না। মানুষের অভিমত জ্ঞান-বুদ্ধির পরিবর্তনশীলতা বিচার বিশ্লেষণ বা অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই মানব রচিত আইন পরিবর্তনশীল।

কোন স্থিতিশীলতা ও চিরন্তনতা মানব রচিত আইনের বুনিয়াদে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই মানব রচিত আইন দ্বারা পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্রে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সঙ্গত-অসঙ্গত, বৈধ-অবৈধ প্রভৃতি মানুষের মতামত

www.pathagar.com

বারংবার পরিবর্তিত হতে থাকে। ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান মানুষের কাছে নেই। তাই মানব রচিত আইন উপস্থিত পরিবেশ সমস্যা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই পরিবর্তিত হয় এবং সেজন্য বিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। একমাত্র আমেরিকায় ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত মদ্য নিবারক আইন কার্যকর করতে ৩০,৮৭,৫০,০০০ ডলার ব্যয় করে নয়শত কোটি পৃষ্ঠাব্যাপী মদের বিরুদ্ধে পুস্তকাদি প্রকাশ করে। ১৯৩৩ সালে মদকে পুনরায় বেআইনী নয় বলে আইন পাশ করা হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামী আইন তার গুরুত্বপূর্ণ বিধান এমনকি অনেক ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও কুরআন ও হাদীসের দ্বারাই প্রণীত হয়। এক কথায় আল্লাহ্‌র ওহীই হচ্ছে ইসলামের আইনের উৎস। আল্লাহ্ তা'আলা কোন কালে বা যুগের সাথে, সীমিত ভাবপ্রবণতা, ক্লান্তি, ভুল ভ্রান্তি পরিবর্তনশীলতা পরিবেশ ও কালের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

২. ইসলামী আইন ও মানব রচিত আইনের দ্বিতীয় মৌলিক পার্থক্য এই যে, মানব রচিত আইন সামাজিক নিয়ম পদ্ধতি, সমাজ-ব্যবস্থা তামাদ্দুনিক কাঠামো ও সংগঠন সংস্থার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত হয়। তাই সমাজের লেজুড় হয়ে থাকতে বাধ্য। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনের নিয়মাবলী আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা পরম পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, তিনি কোন স্বজন-প্রীতি ও বংশের সম্পর্কের সাথে জড়িত নন, তাই তাঁর পেশকৃত আইন উচ্চমানের ও প্রগতিশীল। কালের সংকীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দোষে তা দুষ্ট নয়। তা সমাজের লোকদের অভিমত দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয় না। ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে জনমতের প্রভাবে প্রবর্তিত ও প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ্ সর্বকালের সর্বযুগের সকল দেশের ও সকল মানুষের। তাই ইসলামী আইন মানুষের সকল কালের সকল যুগের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সক্ষম।

৩. ইসলামী আইন ও মানব রচিত আইনের তৃতীয় মৌলিক পার্থক্য, মানবীয় আইন মানুষকে কোন উন্নত নৈতিক মূল্যবোধের দিকে উজ্জীবিত করে না। এ জীবনের পরে অপর কোন জীবনের সামগ্রিক কার্যাবলী, দায়িত্ব কর্তব্যের জওয়াবদিহির প্রত্যয় সৃষ্টি করেনা। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, সমবেদনা, কল্যাণ কামনা ইত্যাদি উন্নত নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেও তা আইনের উপর নির্ভরশীল। হৃদয়ভিত্তিক বা ধর্মীয় নীতির উপর নির্ভরশীল নয়। পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষকে উন্নত-নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধন ও মানব কল্যাণের শিক্ষা দান করে।

www.pathagar.com

উন্নত নৈতিক চেতনা ও আখিরাতের জবাবদিহির ভিত্তিতে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্প্রদানের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার মহান নীতির শিক্ষা প্রদান ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মানবীয় আইন মানুষের ধ্বংস টেনে আনে, আর ইসলামী আইন মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে। একমাত্র ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠাই মানবতার কল্যাণকামী প্রতিটি দেশ ও জাতির জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা মুসলিম দুনিয়ার কল্যাণ রাষ্ট্রসমূহে প্রশ্নচিহ্নিত হতে পারে না ও আখিরাতের মুক্তি পাওয়া যেতে পারে না।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্ব ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি ও সঠিক কর্মসূচী

বর্তমান বিশ্বের অনেক এলাকাই ইসলামী প্রতিষ্ঠার বুলন্দ আওয়াজ উত্থাপিত হয়ে আসছে। ইরান, সউদী আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত, লিবিয়া ও পাকিস্তানে প্রশাসনিক বিভাগে বিভিন্ন দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বিচার ও আইন বিভাগকে ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ দাবি উত্থাপিত হয়েছে। তুরস্কেও জাস্টিস দল দেশকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মদ্রোহীতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে, ক্রমশঃ ইসলামী মূল্যবোধের বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আমরা বর্তমান বিশ্ব তথা বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের প্রকৃত উদ্যোগ কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, কি কর্মপন্থা ও কার্যসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে, এ সম্পর্কেই সংক্ষিপ্ত পথ-নির্দেশ তুলে ধরতে চাই।

লক্ষ্য

১. বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনকে বাস্তবায়িত করতে হলে সর্বপ্রথম দুনিয়ার মানুষকে সাধারণভাবে ও মুসলমানদেরকে—বিশেষভাবে, আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ দীনের আনুগত্যের আহ্বান জানাতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বন্দেগী ও গোলামী একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে, ইসলামে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে খোদার বন্দেগীর বিপরীত, সকল ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার অপরিহার্যতা ঘোষণা করে।

২. ইসলামী আইন তথা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করতে হলে, মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনকে মুনাফেকী তথা ধর্মীয় বৈসাদৃশ্য ও বর্ণচোরা মনোভাব থেকে মুক্ত করে—কথা ও কাজের অমিল থেকে গোটা জীবনকে রক্ষা করতে হবে। শাসনতন্ত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিয়ে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ইসলামী মূল্যবোধে ও ইসলামের মূল দর্শনের বিপরীত আইন-কানুন চালু রেখে কোনদিনই ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। প্রশাসনিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে ইসলামী রাষ্ট্রীয় দর্শনের বিপরীত বিশ্বাসীদেরকে অধিষ্ঠিত রেখে কোনদিনই ইসলামী সমাজ কায়েম করা যায় না।

তাই মুসলিম জিন্দেগীর কোন ব্যবস্থাই ইসলামের বিপরীত দর্শনকে ভিত্তি করে পরিচালনা করা যাবে না। বরং সকল প্রকার মুনাফেকী বিসর্জন দিয়েই ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

৩. সমাজ জীবনে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ ইবাদত তথা কামেল দীন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বেঈমান, ফাসেক, মুনাফিকদেরকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত রেখে কোন সমাজে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যারা দেখেন—তারা বেকুফের জান্নাতে বাস করেন। যতদিন পর্যন্ত ফাসেক কাজের, মুনাফিক শয়তানের গোলাম, অসৎ চরিত্রের অধিকারীরা দেশ ও সমাজের নেতৃত্বে সমাসীন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মানুষের জীবন থেকে জুলুম, অত্যাচার, অশান্তি, বিপর্যয়, ভাঙন, নৈতিক অবক্ষয়, দুর্নীতি ও খোদাদ্রোহীতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে না।

তাই ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে হলে গোটা বিশ্বের বিশেষ করে মুসলিম জাহানের বুক হতে খোদাদ্রোহী ফাসেক কাজের পথভ্রষ্ট নেতৃত্বের পরিবর্তে সঠিক কর্মপন্থা ও পদক্ষেপ কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে তার একটা সুন্দর চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ইসলামী আদর্শ ও চরিত্রভিত্তিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের আশা ঘোষণা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তেমনি ইসলামী চরিত্রহীন নেতৃত্ব দিয়ে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আশাও করা যায় না।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কার্যসূচি

লক্ষ্যত্রয়কে কার্যকর করতে হলে, আদর্শ বিপ্লবের যে চিরন্তন বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব কর্মসূচী রয়েছে তা গ্রহণ করা ছাড়া কোনদিনই কোন দেশ ও কোন সমাজে ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হতে পারে না। কোন জনগোষ্ঠী বা ভূখণ্ড ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে আর সে ভূখণ্ডে তার নিজস্ব চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের বিপরীত আদর্শ প্রচারের ব্যাপক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে, উদারতা ও পরমত-সহিষ্ণুতার নামে ত্রিতত্ত্ববাদ, নাস্তিক্যবাদ, নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টিকারী শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবাধ চর্চার মুক্ত অধিকার দিয়ে যাঁরা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রকৃত ও পবিত্র ইসলামী আইন প্রবর্তন করতে পারেন না। একদিকে নৈতিক উন্নয়নের জন্য চীৎকার করে, মানুষের নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টিকারী প্রচার-প্রচারণা প্রদর্শনী বন্ধ না করে, ইসলামী আইন কার্যকর করা যায় না। ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হবে, ইসলামী আদর্শের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করে ইসলাম বিরোধী দর্শনে বিশ্বাস ও প্রভাব থেকে মানুষের মনমানস-চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে পবিত্র করা। চিন্তার পবিত্রতা ছাড়া কোন সমাজে কোন আদর্শই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিপ্লব—সমাজে শুধু অস্ত্র দিয়ে আসে না। বিপ্লব আসে সর্বপ্রথম মানুষের চিন্তার জগতে। চিন্তার বিপ্লবই চরিত্রের বিপ্লব আনে। আর চরিত্র বিপ্লবই বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারীদের সুসংগঠিত করে, সমাজ-সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের কার্যক্রম গ্রহণ করে। তাই ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম শিক্ষা, দর্শন, প্রচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় দর্শনের মৌলিক বিষয়ে ইসলামী মূল্যবোধের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। রেডিও, টেলিভিশন, সাহিত্য, সংবাদপত্র ও প্রচারের যাবতীয় ব্যবস্থাপনাকে ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তব শিক্ষা ও দর্শনকে তুলে ধরে চিন্তা ও বিশ্বাসের বিশুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, ইসলাম বিরোধী আদর্শের প্রচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম জীবন-ব্যবস্থা এ বিশ্বাস সমাজের লোকদের মধ্যে সৃষ্টি করে সত্যিকার ইসলামী সমাজ কায়েম করা না হলে, মানব গোষ্ঠীর দৃষ্টি পরিবর্তন এবং আস্থাভাজন হওয়া যায় না। এ জন্য সর্বাগ্রে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা, মানুষের মনমানস ও বিশ্বাস তওহিদী প্রত্যয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে পবিত্র করতে হবে।

ইসলামী জীবন দর্শন সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমে যারা মানব রচিত আইনের ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন উপলব্ধির পর, ইসলামকে সর্বোত্তম জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করবে, তারাই ইসলামী আইনের সত্যিকার অনুসরণকারী হিসাবে বিবেচিত হবে। ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক

www.pathagar.com

কার্যসূচি হলো, ইসলামী জীবন-দর্শনের প্রতি প্রত্যয়শীল লোকদেরকে সু-সংগঠিত করে তাদের চরিত্রকে ইসলামী আদর্শের বুনিয়াদে গড়ে তোলা। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করে তাদের চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তোলা। আর এ সংশোধিত চরিত্রের অধিকারী লোকদেরকে সংগঠিত করা।

তৃতীয় কার্যসূচি হলো ঃ ইসলামী চরিত্রের সংগঠিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সমাজের ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

চতুর্থ কার্যসূচি হলো ঃ ইসলামী চরিত্রে সংগঠিত ব্যক্তিদেরকে সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করে, সত্যিকার ইসলামী নেতৃত্ব কায়েম করে পরিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গড়ে তোলা। উপরোক্ত লক্ষ্য ও কার্যসূচি বাস্তবে গ্রহণ করা ছাড়া কোন ভূখণ্ডে সত্যিকার ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মানুষের অন্তরে ইসলামের সত্যিকার রূপ উদ্ভাসিত করে তাদের পবিত্র চরিত্র গঠনে অনুপ্রাণিত করে তোলার পূর্বশর্ত হচ্ছে রাষ্ট্র-দর্শন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির পরিবর্তন করা। বাস্তব জীবনে এসবের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। সেরূপ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। ইসলামী চরিত্র সম্পন্ন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যতীত যদি কোন ভূখণ্ডে সাময়িকভাবে উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করে, অস্ত্রের বিপ্লব করে ক্ষমতার রদ-বদলের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে সেখানে পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ কায়েম হবে না। বরং মানবিক কিছু আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ ঘোষণা দিলেই সে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কোন মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না এবং দীর্ঘস্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করা যেতে পারে না।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম মুসলিম বিশ্বকেই সত্যিকার আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নজীর স্থাপন করতে হবে। মুসলিম বিশ্ব যদি স্ব-স্ব ভূখণ্ডে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ না করে, বর্তমানের রাক্ষসী পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদী ব্যবস্থায় লিপ্ত থাকে, সাম্যবাদের নামে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে সাধারণ বিশ্বেও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কোন উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হওয়ার আশা করা যেতে পারে না। মুসলিম জাহানে অনেক দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা না থাকায় বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার পথে এক বিরাট প্রতিরোধ সৃষ্টি করে রেখেছে।

১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষের অন্তরকে ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গড়ে তোলা, চিন্তা ও বিশ্বাসে ইসলামী প্রত্যয় সৃষ্টি ও ইসলামী আইনকে কার্যকর করতে হলে সর্বপ্রথম করণীয় ভবিষ্যৎ বংশধরকে ইসলামের চিন্তা ও বিশ্বাসের বুনিয়াদে গড়ে তোলা; তাদের

www.pathagar.com

চরিত্রকে ইসলামের পবিত্র ঈমান ও আমলে ভরপুর করে দেওয়ার জন্যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ইসলামী আইন ও মূল্যবোধের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

২. ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদ

সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে ও বর্তমান আইনকে ইসলামী আইনে পরিবর্তিত করতে হলে একটি ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। বর্তমানে একমাত্র পারিবারিক জীবনে উত্তরাধিকারী আইন, বিবাহ-সাদী ইত্যাদি কয়েকটি দিক ছাড়া গোটা আইন ব্যবস্থাই ইউরোপীয় আইন ও ব্যবস্থাকেই মেনে চলেছে। ফৌজদারী আইন তো সম্পূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী। রাতারাতি একটি ঘোষণা বা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে দেশে ইসলামী আইন চালু হয়ে যাবে না। ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে আইনকে ইসলামী আইনে উপদেষ্টার দায়িত্ব সম্পাদন ও আধুনিক আইনকে রহিত করে ইসলামী আইন প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার জন্যে গবেষণা ও পরামর্শের জন্যে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আইন-একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এ একাডেমী দেশের ইসলামী ও জ্ঞানে পারদর্শী প্রজ্ঞাবান ওলামা, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী আইনজীবী, ইসলামী জীবনাদর্শে আধুনিক শিক্ষিত পণ্ডিতদের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে।

৩. শাসনতান্ত্রিক সংস্কার

তৃতীয় যে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে তা হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। বর্তমান শাসনতন্ত্রকে আরও সংস্কার ও সংশোধন করার প্রয়োজন। ইসলাম ও গণতন্ত্রকে মূল্যবোধের পরিপন্থী ধারাসমূহকে অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। ঈমান আমলের মূল ভিত্তি–শুধু এটুকুই সংশোধন যথেষ্ট নয়। বরং পরিষ্কার ভাষায়, কুরআন ও সুন্নাহকে শাসনতন্ত্রের মূল উৎস হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। এছাড়া শাসনতন্ত্রের ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্তন ছাড়া ইসলামী আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ইসলামী যিন্দেগীর চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌কে খুশী করা। সরকারের নীতি একান্ত সুস্পষ্ট হওয়া দরকার যে, ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে কারো মান-অভিমানের, সন্তুষ্টির তোয়াক্কা না করে একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্য ও রেজামন্দির উপর দৃঢ় আস্থা রেখে গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামের আদর্শ মুতাবিক পরিচালনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সরকারের শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে নিম্নোক্ত ধারা সংযোজন করা উচিত ঃ

ক) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আল্লাহ্‌র আইন মুতাবিক দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে।

www.pathagar.com

ঋ) রাষ্ট্রের আইন পরিচালিত হবে ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক এবং আইনের উৎস হবে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।

গ) অতীতের যে সকল আইন, বিধান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী তা পর্যায়ক্রমে কুরআন ও সুন্নাহ্ মুতাবিক বদলাতে হবে এবং ভবিষ্যতে কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন ও জারী করা হবে না।

ঘ) সরকার ও জনগণের কার্যাবলী, দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ মুতাবিক পরিচালিত হবে। শরীয়তের সীমার বাইরে কেউ কোন অধিকার ভোগ করতে পারবে না।

(ঙ) দেশে প্রতিরক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ইসলামী জীবন দর্শনের বিপরীত বিশ্বাসী ও ইসলামী চরিত্র বিরোধী কোন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে যে রাষ্ট্রের জনগণ ও সরকার আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় আস্থাশীল নয়, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক জীবনধারা ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে সম্মত নয়, তাদের হিফাজতের ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের দায়িত্বও আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না।

৪. আইন শিক্ষার সংস্কার

মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনকে কার্যকরী করতে হলে আইন ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে একজন আইনবিদ ইসলাম ও আধুনিক আইনে পারদর্শী হয়ে বেরুতে পারেন। আইন কলেজের ছাত্রদের জন্যে অবশ্যই আরবী বাধ্যতামূলক বিষয় থাকতে হবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

আইনের পাঠ্য তালিকায় আধুনিক আইন, ইসলামী আইন, ইসলামী আইনের মূলনীতি ও বিভিন্ন নিরপেক্ষ ও তুলনামূলক অধ্যয়নের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। আইনের ছাত্রদেরকে মৌলিক গবেষণার যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আইন অধ্যয়নের সাথে ইসলামী আইনের বাস্তব অনুশীলন ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. বিচার ব্যবস্থার সংস্কার

ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ কর্মপন্থা বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। বিচার প্রাপ্তির বিলম্বিত হওয়ার ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। কোর্ট ফি রহিত করে বিচার ব্যবস্থাকে সহজলভ্য করতে হবে। বিচার ব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত ও প্রভাব থেকে মুক্ত করার নিমিত্তে বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ

www.pathagar.com

ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। এছাড়া সুবিচার প্রাপ্তির জন্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন ও ওকালতি পেশার সংস্কার।

আল-কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে-"ফালা-নাতুল্লাহি আলাল্ কাযিবীন।"

-"মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।" আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাবাদীদেরকে পছন্দ করেন না ও ভালবাসেন না। সমাজে সুবিচার প্রাপ্তির ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করতে অবশ্য এ মিথ্যার অভিশাপ বাহাদুরী থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। আইন পেশা সম্পূর্ণ বন্ধ করার প্রয়োজন হবে না। প্রতিযোগিতামূলক মিথ্যা সৃষ্টি ও মিথ্যার বাহাদুরী থেকে বিচার ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে হবে। মিথ্যার লা'নত আপাদ-মস্তক ঢেকে, সমাজের নেতৃত্বের বহাদুরীকে চূর্ণ করে আইনজীবীদেরকে সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও আল্লাহ্-প্রেমিক হতে হবে। সমগ্র ব্যবস্থাও যদি কুরআন ও হাদীস মুতাবিক গড়ে তোলা হয়, অথচ এ মিথ্যার প্রতিযোগিতা সমাজে চালু থাকে তাহলে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ইসলামী আইনের কল্যাণ থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকবে।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন সকল শ্রেণীর মানুষের মনে এক বিরাট জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। মতবাদ বিভ্রান্ত বিশ্ব আজ একটি শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার প্রতীক্ষায় আছে। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানব জীবনে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। মানুষ এ ব্যবস্থা হতে মুক্তি লাভের আশায় সাম্যবাদী ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষার কষ্টি পাথরে এ কৃত্রিম সাম্যবাদী ব্যবস্থাও মানুষের সত্যিকার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছে। আজ এ আন্দোলন দুনিয়ার সব জায়গায় এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী শক্তিগুলো এ আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার, জুলুম, নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুক্তি হচ্ছে–"ইসলাম একটি ধর্মমাত্র। ধর্মে আবার রাষ্ট্র ব্যবস্থার অস্তিত্ব কোথায় ? ধর্মকে রাজনীতি ক্ষেত্রে টেনে আনা, তাকে অপবিত্র করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন অস্তিত্বই নেই। প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে হলে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে রাখতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।"

ইসলামী আইনের দাবি উত্থাপন করা হলে এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ তথাকথিত উদার রাজনৈতিক মতবাদ সম্পন্ন দলগুলো বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের নজির পেশ করে বলে থাকে, অমুক দেশে এ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই, এখানে তা চলবে কেমন করে ? আসলে এ সব অতি উদারপন্থিগণ ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রের পার্থক্যটুকুও জানেন না! তাই অনেক সময় তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিদেরকেও পর্যন্ত এ ধরনের যুক্তি দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখা যায়। এ প্রবন্ধে তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। আমার আলোচনাকে নিম্নলিখিতভাবে পেশ করবো ঃ

১. রাষ্ট্রের পরিচয়, লৌকিক রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্র, ৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, ৪. ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের উৎস, ৫. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

১. রাষ্ট্রের পরিচয়

সরকার, জনগণ ও আইনের শাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভৌগলিক এলাকাকে রাষ্ট্র বলা হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন হয়

www.pathagar.com

সরকারের। আর দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্যে প্রয়োজন হয় আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থার। যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলা হয়।

২. লৌকিক রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্র

রাষ্ট্র সাধারণত দুই ধরনের ঃ লৌকিক রাষ্ট্র ও আদর্শবাদী রাষ্ট্র। লৌকিক রাষ্ট্রে কোন আদর্শ বা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। লৌকিক রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রও বলা হয়। একে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র না বলে ধর্মহীন রাষ্ট্রই বলা শ্রেয়। সেক্যুলার রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্যে কোন স্থায়ী মূলনীতি স্বীকার করা হয় না। আল্লাহ্‌র স্বীকৃতি এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আদৌ প্রয়োজন নেই আর যদি কোথাও পরোক্ষভাবে এর স্বীকৃতি থাকে, তবে তা শক্তিমান আল্লাহ্‌র নয় বরং এক দুর্বল সত্তার। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নীতি সবসময় পরিবর্তনশীল। কারণ, সেখানে আইনের উৎস হিসেবে কোনও স্থায়ী আদর্শের স্বীকৃতি নেই। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোথাও ব্যক্তি বিশেষ, দল বিশেষ, আবার কোথাও পরিষদ সদস্যদের অধিকাংশের মতের উপরই রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন নির্ভরশীল, যার ফলে ব্যক্তি বা দলের পরিবর্তনের সাথে সাথেই গোটা রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। মূলত ধর্মহীন রাষ্ট্রকে আমরা খোদাদ্রোহী রাষ্ট্রই বলতে পারি। কেননা, স্থায়ী কোন আদর্শকে স্বীকার না করার ফলে সেখানে মানবীয় প্রভুত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ফলে মানবরূপী প্রভুদের অত্যাচারের ফলে গণজীবনে খোদদ্রোহীতা, চরিত্রহীনতা ও জুলুম নির্যাতনের ধ্বংসকর ব্যবস্থারই রাজত্ব অবাধে চলতে থাকে। মানুষ সেখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। খোদাদ্রোহীতার সয়লাবে সমগ্র জাতি ভেসে চলে।

অন্যদিকে আদর্শবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি সুস্পষ্ট আদর্শকে আইন, শাসন, বিচার ইত্যাদি রাষ্ট্রের সমগ্র বিভাগে স্থায়ী মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইসলাম মূলত আদর্শবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শকেই সে স্থায়ী মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে। যে রাষ্ট্র সরকার ও জনগণের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, আইন, শাসন, বিচার ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তা-ই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ইসলামী রাষ্ট্র মূলত তওহীদ, রিসালত ও খিলাফতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহকে একক শক্তি হিসাবে স্বীকার করে, রাসূল (সা)-কে তাঁর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবী হিসাবে গ্রহণ করে, রাসূলের প্রদত্ত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে, মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে তাঁর মর্জী মুতাবিক এই রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এক কথায় তাওহীদ ও রিসালতের আকীদাকে স্বীকার

www.pathagar.com

করে কুরআন ও সুন্নাহ্ প্রদত্ত বিধানকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে কার্যকরী করে খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

ব্যক্তি জীবনে ইসলামের মৌলিক ইবাদত ও নির্দেশসমূহ পালন করা সত্ত্বেও যদি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কুরআন সুন্নাহ্র বিধান গ্রহণ না করা হয়, তবে তা কোনদিনই ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে না। সেখানকার রাষ্ট্রনায়কগণ সারা দুনিয়ায় ইসলামের তাবলীগ করে বেড়ালেও তা ইসলামী রাষ্ট্র হবে না। বরং মুসলমান রাষ্ট্রনায়ক দ্বারা পরিচালিত বলে তাকে মুসলিম রাষ্ট্রই বলা হবে।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের বুনিয়াদে কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করে যে ভূখণ্ডের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলে এবং সেখানে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে খিলাফতের ধারণার ভিত্তিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও তার সমর্থিত সরকার ব্যবস্থাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়। ইসলাম বিশ্বজনীন আদর্শ তাই ইসলামী আদর্শে বুনিয়াদে 'বিশ্বজনীন আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইসলামী জীবনদর্শন সম্পর্কে অজ্ঞ জড়বাদী শিক্ষার আস্তাকুড়ে লালিত পালিত অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে পোপবাদ ও ঈশ্বরতন্ত্রের সাথে তালগোল পাকিয়ে তোলেন। এটি ইসলামী আদর্শের অবমূল্যায়ন বৈ আর কিছুই নয়। ইসলামে পোপবাদ বা যাজক শ্রেণী বা মোল্লাতন্ত্রের কোন স্থান নেই। ইসলাম নির্ভেজাল তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের বিশ্বাসের বুনিয়াদে অসীম জ্ঞানময় আল্লাহ্ প্রদত্ত এক কল্যাণকর জীবন পদ্ধতি। ইসলামকে পাশ্চাত্য জগতের তথাকথিত ব্যক্তিগত ধর্মের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার অপচেষ্টা করা নিছক অজ্ঞতারই নামান্তর। ইউরোপের অবাস্তব গণতন্ত্রের জন্মের বহু পূর্বে ইসলামই সত্যিকার গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্ববাসীকে মদীনার চুক্তিই সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান উপহার দিয়েছে। ইসলাম শুধু নৈতিক ও আধ্যাত্মক বিপ্লবের কর্মসূচীই নয়। ইসলাম অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনালেখ্য। ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে সত্যিকার জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্র পাশ্চাত্য নগ্ন ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের অক্টোপাশে মানব জাতিকে নিষ্পেষিত ভ্রান্ত মতবাদ উপস্থাপিত করেনি। ইসলাম সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানিয়ে আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে এক বিশ্বজনীন আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলনীতিই উপস্থাপিত করেছে। এক কথায় ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এই–"আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব,

www.pathagar.com

কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদ ভিত্তিক আইনের শাসন, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বশান্তির জয়গানে উদ্বুদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানে আনুগত্যশীল জনসমষ্টি ও ভূখণ্ডই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র।"

৪. আইনের উৎস

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আইনের উৎস হিসাবে মানুষের ইচ্ছা ও মতামত চূড়ান্ত। আর ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের উৎস হলো ঃ (ক) কুরআন, (খ) সুন্নাতে রাসূল, (গ) ইজমা ও (ঙ) কিয়াস। কুরআন ও হাদীস মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কোথায়ও বিস্তারিত আইন দিয়েছে, কোথায়ও শুধু মূলনীতি নির্ধারণ করেছে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে যখন সেখানে বিস্তারিত সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না তখন সে সব ব্যাপারে সত্যিকার ইসলামী চিন্তানায়কগণ কুরআন ও সুন্নাহ্র মূলনীতিকে সামনে রেখে চিন্তা গবেষণা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। কুরআন ও সুন্নাহ্র মূলনীতির ভিত্তিতে এই চিন্তা গবেষণার নামই হচ্ছে 'ইজতিহাদ'। এই ইজতিহাদ যখন ইসলামী চিন্তানায়কদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পরিণত হয়, তখন তা হয় 'ইজমা'। আর যখন চিন্তানায়কগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তা হয় 'কিয়াস'।

৫. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

কোনো রাষ্ট্রের পরিচালকগণ সে রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেই তা ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যায় না। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্যে নিম্নে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো অপরিহার্য। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ বৈশিষ্ট্য নেই, তা কোনোদিনই প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করার অধিকার রাখে না।

খোদায়ী সার্বভৌমত্ব ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র বুনিয়াদীভাবে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেনে নেবে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধিকে অথবা জনগণকে সার্বভৌম ও নিরঙ্কুশ শক্তি হিসাবে গ্রহণ করবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে সার্বভৌম শক্তি বলতে এক চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব ও সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিকেই বুঝায়। এ শক্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কুরআন মজীদে আয়াতুল কুরসীতে সার্বভৌম শক্তির পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা, যিনি ছাড়া আর কোনো সার্বভৌম শক্তি নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তিনিই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আসমান ও যমীনের সব কিছুর একমাত্র মালিক তিনি। তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করার সাহস কার আছে ? অতীত-ভবিষ্যতের সবকিছু তিনি জানেন। তার জানার বাইরে কিছু নেই।"

কুরআন মজীদে আরও বলা হয়েছে, "সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন

www.pathagar.com

তোলার অধিকারও কারও নেই। তাঁর সমকক্ষ কোনো ক্ষমতা নেই। তাঁর হুকুম পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারও নেই।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "জেনে রেখো, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো সর্বোচ্চ ক্ষমতা নেই; তিনি ছাড়া হুকুম চালাবার অধিকার কারও নেই।"

রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মতবাদের সঙ্গে ইসলামের কোনো মিল নেই। অন-ইসলামী রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মানুষের ইচ্ছাকেই পূর্ণ করে থাকে। কোথাও সে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যক্তি বিশেষের মর্জীকে কার্যকরী করার জন্যে জন্মলাভ করে, আবার কোথায়ও অধিক সংখ্যক জনগণের মর্জী মুতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনার লিখিত ওয়াদা প্রদান করে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র নীতিগতভাবে আল্লাহ্র মর্জীকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের উপর আল্লাহ্র মর্জীকে প্রতিষ্ঠিত করাকে তাঁর উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করে। আল্লাহ্ প্রদত্ত কল্যাণকর জীবনাদর্শকে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকরী করাই হলো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "মু'মিনদের মধ্যে যাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা আসবে তারা আল্লাহ্র যমীনে নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ্র পছন্দনীয় ও মানুষের জন্যে একমাত্র কল্যাণকর 'মারুফ'-কে কায়েম করবে। আর আল্লাহ্র নিকট অপছন্দনীয় মানুষের জন্যে ধ্বংসকর মুন্কারের মূলোৎপাটন করবে।" কুরআন মজীদে আরো বলা হয়েছে, "আমি নবীদেরকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রকৃত সত্যভিত্তিক কিতাব ও ন্যায়ের মানদণ্ড সহকারে এজন্যে পাঠিয়েছি যে, তাঁরা মানব জীবনে ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থা কায়েম করবে। মানব সমাজে সত্যিকার ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করবে।"

গণতান্ত্রিক সরকার ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোনদিনই একনায়কত্বভিত্তিক হবে না। দলীয় একনায়কত্ব, বংশীয় একনায়কত্ব ও ব্যক্তিগত একনায়কত্ব–এক কথায় কোনো প্রকার একনায়কত্ব বা ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থাতেই ইসলাম আদৌ সম্মত নয়। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, "মু'মিনদের কার্য পরিচালিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে" (কুরআন)।

অন্যত্র বলা হয়েছে "হে রাসূল! আপনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করুন" (কুরআন)। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উড়ে এসে জুড়ে বসে জনগণের নেতা সাজার অধিকার কারও নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার গঠন-পদ্ধতি কোনো দিনই অগণতান্ত্রিক হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে তাঁর পরে কে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি এটা জানা সত্ত্বেও তাঁর খলীফা নিযুক্ত করে যাননি। তিনি এ দায়িত্ব সাহাবাদের উপরই অর্পণ

www.pathagar.com

করে যান। ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার গঠন, রাষ্ট্রপ্রধান ও আইন পরিষদ গঠন ইত্যাদি সবকিছুই নির্বাচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে হবে। পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। হযরত উমর (রা) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শূরা (পরামর্শ)-মূলক ব্যবস্থা লংঘন করে জবরদস্তিমূলকভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, সে নিশ্চয়ই হত্যাযোগ্য অপরাধ করেছে।" (আল ফারুক ঃ মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল)

হযরত আলী (রা) বলেছেন, "আমার আনুগত্যের শপথ, খিলাফতের নির্বাচন মুসলমানদের সম্মতি ব্যতিরেকে গোপনভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি।" (তাবারী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–"আল্লাহ্র শপথ! আমরা কিছুতেই তাদের হাতে নেতৃত্ব অর্পণ করতে পারি না, যারা শুধু এটাই কামনা করে এবং এর প্রতি লোভ করে।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন, "যদি তুমি নিজে নেতৃত্ব চেয়ে নাও, তাহলে তুমি অপমানিত হবে। কেননা, আল্লাহ্ তোমার এ কাজকে পছন্দ করেন না, তোমার কাজে আল্লাহ্র সাহায্য থাকবে না। আর জনগণ যদি তোমাকে নেতৃত্ব দেয়, তবে নেতৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহ্ও তোমাকে সাহায্য করবেন।" ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার কোনদিনই জনগণের অনাস্থাভাজন হবে না এবং জনগণের প্রতিও তাঁদের অনাস্থার ভাব সৃষ্টি হবে না। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিছক দমননীতি অবলম্বন করে টিকে থাকার অপচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, তাকে কোনদিনই ইসলামী সরকার বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে না। উত্তম সরকার ও নিকৃষ্টতম সরকারের পরিচয় নবী করীম (সা) একটি হাদীসে খুব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম নেতৃত্ব সেটাই যেসব নেতাদেরকে তোমরা পছন্দ করবে, ভালবাসবে, আর তাঁরাও তোমাদেরকে পছন্দ করবে ও ভালবাসবে। তাঁরা তোমাদের কল্যাণ চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে ও তোমাদের মঙ্গলের জন্যে আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত করবে, আর তোমরাও তাঁদের কল্যাণের জন্যে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করবে। তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম নেতৃত্ব হচ্ছে সেটা যে নেতাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে, তাদের উপর তোমাদের অনাস্থা থাকবে এবং তারাও তোমাদের উপর অনাস্থা পোষণ করবে, তারা তোমাদের উপর জুলুম চালাবে ও অভিশাপ দেবে এবং তোমরাও তাদেরকে অভিশাপ দিতে থাকবে।" (মুসলিম)

আইনের শাসন ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা শুধু মুখে মুখে আইনের শাসনের কথা প্রচার করে না। বাস্তবক্ষেত্রে ইনসাফমূলক 'খোদায়ী আইনের শাসন' প্রবর্তন করে। আইনের চোখে সকলকে সমান অধিকার দান করে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

আদালতে সরাসরি অভিযোগ করার পথ উন্মুক্ত থাকে। শাসনযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তথাকথিত প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার মতো শাসন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হয় না। আইনের চোখে রাষ্ট্র প্রধান ও একজন সাধারণ নাগরিকের সমান অধিকার বাস্তবে স্বীকৃতি লাভ করে। একজন মেথরও রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ পেশ করলে তাকে সাধারণ অপরাধীর মতো আদালত কক্ষে হাযির হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্বের কোনো স্থান নেই। একবার এক কুরায়শ বংশীয় মহিলা চুরির অপরাধে ধৃত হলে কেউ তাকে ক্ষমা করার পক্ষে চুপিচুপি মন্তব্য করায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তদুত্তরে বলেছিলেন, "যদি আমার মেয়ে ফাতিমা (রা)-ও চুরি করতো তবে আমি তার হাত কাটার হুকুম দিতাম।"

বিভিন্ন বিভাগের কর্মসীমা ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকার, জনগণ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের নির্দিষ্ট কর্মসীমা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক রাখতে হবে।

শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করার, তাঁকে প্রভাবান্বিত করার বা তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার কোনো অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেই। শাসন বিভাগ আল্লাহ্র দেয়া সীমাকে লঙ্ঘন করে কোনো ফরমান বা অর্ডিন্যান্স জারী করার অধিকার রাখে না।

শাসন বিভাগকে প্রত্যেক কাজেই আল্লাহ্র সীমাকে রক্ষা করে চলতে হবে। ইসলাম বলে, 'এ হচ্ছে আল্লাহ্র সীমা, আল্লাহ্র সীমাকে লঙ্ঘন করো না। যারা এ সীমালঙ্ঘন করে তারা জালিম (কুরআন)। শাসন পরিচালনায় কোনো অনৈসলামী ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুতেই ইসলাম সম্মত নয়। ইসলাম বলে, "যারা আমার শরীয়তে কোনো বিদায়াত সৃষ্টি করে, তারা আমার উম্মত নয়। (হাদীস)

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "সেই সব সীমালঙ্ঘনকারী শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করো না, যারা খোদায়ী শাসনকে অমান্য করে আল্লাহ্র যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সমাজকে সংশোধন করে না" (কুরআন। খোদায়ী আইনের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার অধিকার ইসলামী আদালতের নেই। ইসলামী আদালতের দায়িত্ব ও কর্মসীমা হচ্ছে যাবতীয় ব্যাপারে খোদায়ী বিচার ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাবের ভিত্তিতে যাবতীয় কার্যের ফয়সালা কর" (কুরআন)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ "তুমি সেই কিতাব অনুসারে আইন (প্রণয়ন) ও শাসন (পরিচালনা) করো যা তোমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। তোমার নিকট প্রকৃত সত্য অবতীর্ণ হওয়ার পর নিজের বিবেক অনুসারে রায় দিলে তুমিও জালিমদের পর্যায়ভুক্ত হবে" (কুরআন)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "আমি শুধু সেই ফয়সালা দিয়ে থাকি, যা আমার নিকট অবতীর্ণ হয়।"

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের নির্দিষ্ট কর্মসীমা রয়েছে, সরকার কোনো ব্যাপারে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাকে লঙ্ঘন করতে পারে না, কোনো ব্যাপারেই জনগণের নিকট শর্তহীন আনুগত্যের দাবি করতে পারে না। বিনা দ্বিধায়, বিনা শর্তে আনুগত্য করার দাবি একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই করতে পারেন। সরকার শুধু ততক্ষণই জনগণের আনুগত্যের দাবি করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারী ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ্র সীমাকে লঙ্ঘন না করা হয়। এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রথম ভাষণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই মু'মিন, সৎ ও যোগ্য হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার ও জনগণের মধ্যে কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসা করার জন্যে সর্বোচ্চ শক্তি হচ্ছে আল্লাহ্র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ্।

সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণের উপর কুরআন ও সুন্নাহ্ মুতাবিক শাসন পরিচালনা করে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের জন্যে সরকারের আনুগত্য করা ফরয। মোটকথা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, সরকার ও জনগণ সকলকেই আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমার ভিতরে থেকে কাজ করতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধানের জন্যে জরুরী গুণাবলী ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যি হচ্ছে এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে কতিপয় জরুরী গুণাবলীকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করে। ইসলামী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে সর্বপ্রথম জরুরী শর্ত হচ্ছে এই যে, তাঁকে অবশ্যই প্রকৃত মুসলিম হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, তাঁকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, তাকে বালেগ ও আকেল অর্থাৎ বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। চতুর্থ শর্ত হচ্ছে এই যে, তাকে অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–'পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশালী।' কুরআনে আরও বলা হয়েছে–"তোমাদের মূল কর্মক্ষেত্র গৃহ, তোমরা গৃহকার্যে নিয়োজিত থাক, বর্বর যুগের বেহায়া মেয়েদেরকে অনুসরণ করে রাস্তাঘাটে বেহায়াপনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ঘোরাফিরা করো না।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "যখন সমাজের নিকৃষ্টতম চরিত্র সম্পন্ন লোকগণ তোমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, ধনীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের নেতৃত্ব নারীর হাতে অর্পিত হবে, তখন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করবে।' (হাদীস)

প্রথম শর্তের ব্যাপারে কোনো প্রকার প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজনই নেই, কেননা, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান অমুসলিম হবে এমন কথা কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি

www.pathagar.com

কল্পনাই করতে পারে না। তৃতীয় শর্ত সম্পর্কে কুরআন মজীদের সেই আয়াতটিই যথেষ্ট, যেখানে এতিমের সম্পদ তার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে পরিণত বয়স্ক ও সুস্থ জ্ঞানের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম যেখানে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও বিবেকবুদ্ধিহীন লোকের হাতে ব্যক্তিগত সম্পদ তুলে দিতে নিষেধ করেছে, সেখানে একটি দেশের শাসনভার একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক অথবা বিবেক বুদ্ধিহীন লোকের হাতে তুলে দেওয়ার মতো গাঁজাখোরী ব্যবস্থাকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। ৪র্থ শর্তের ব্যাপারে কুরআন মজীদের সেই আয়াতটিই যথেষ্ট, যেখানে বলা হয়েছে–'যারা ঈমান এনেছে, অথচ ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করেনি, তাঁরা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের উপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই' (কুরআন)। তাছাড়া রাষ্ট্রনীতির অ, আ, ক, খ-এর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও একজন ব্যক্তিকে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ ব্যতিরেকে কিছুতেই ঐ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার কল্পনাও করতে পারে না।

৮. মৌলিক প্রয়োজন ও মৌলিক অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সপ্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন একজন সাধারণ নাগরিকও জীবনের মৌলিক প্রয়োজন ও মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত থাকতে পারে না। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোন নাগরিকই বঞ্চিত থাকতে পারে না। বিধবা, অন্ধ ও পঙ্গুদের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিজ হাতে গ্রহণ করতে হবে। বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে একজন নাগরিক বিনা চিকিৎসায় ও অনাহারে মারা গেলে রাষ্ট্র পরিচালককে এজন্য আল্লাহ্‌র আদালতে দায়ী হতে হবে। জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদীহী করতে হবে। হযরত উমর (রা) বলেছেন, 'আমার রাজ্যে সুদূর তাইগ্রীস নদীর উপকূলবর্তী এলাকায় যদি একটি ছাগল-ছানাও না খেয়ে মরে যায়, তাহলে আমাকে আল্লাহ্‌র দরবারে জবাব দিতে হবে।' মৌলিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার মতো অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা কোন দিনই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্থান পেতে পারে না। ব্যক্তিচিন্তার বিকাশ ও উন্মেষ এবং ব্যক্তিগত প্রতিভার স্ফূরনকে ইসলামী রাষ্ট্রে বন্ধ করে দেওয়া তো দূরের কথা রীতিমত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উৎসাহিত করার ব্যবস্থাকেই ইসলাম পছন্দ করে। ধর্মীয় স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, দল গঠনের স্বাধীনতা সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সব স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিপন্থী না হয় অথবা প্রত্যক্ষভাবে আইন-শৃংখলা ভঙ্গ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত কারো এ অধিকার কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থাকে ইসলাম কস্মিনকালেও সমর্থন করে না। নাগরিকের অধিকার হরণ করার পরিবর্তে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও

www.pathagar.com

নাগরিকদের জীবন-যাত্রার নূন্যতম প্রয়োজনীয়তা পূরণ করারও দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। কোন নাগরিককে তার অধিকার হতে বঞ্চিত রাখা খোদাদ্রোহীতার শামিল। আল্লাহ্ মানুষকে যে অধিকার দিয়ে পাঠিয়েছেন সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা খোদার উপর খোদকারী বৈ আর কিছুই নয়।

৯. অমুসলিমদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ৮ম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারীদেরকে দেশদ্রোহী, দেশের শত্রুদের দালাল, বহির্শত্রুর ক্রীড়নক, প্রতিক্রিয়াশীল, কুচক্রী ইত্যাদি গালিগালাজ করা হয়। রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে মত বিরোধকারীদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। এটি একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, এখানে রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে শুধু ভিন্ন মত পোষণ করার স্বাধীনতাই ঘোষিত হয়নি বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আলোচনা করার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীরা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণ না করে, আইন শৃংখলাকে লংঘন না করে ততক্ষণ তাদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার অধিকারকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিছুতেই স্বীকৃতি দেয়নি। শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করা ও জনমত সৃষ্টি করার অধিকার রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারীদের জন্যও খোলা রয়েছে। এমনকি উপার্জন ক্ষমতাহীন অমুসলিমদের কর মওকুফ, বেকার ভাতা ও শিক্ষাভাতা দেওয়ার নির্দেশও ইসলাম প্রদান করে।

১০. ব্যক্তি স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার নবম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার পথ চিরতরে উন্মুক্ত। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বড় বড় বুলি আওড়িয়ে যাওয়া স্বত্বেও ব্যক্তির স্বাধীনতাকে পদে পদে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। ব্যক্তির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বিভিন্ন পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। ব্যক্তির প্রতিভা ও যোগ্যতা বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হচ্ছে। অধিকাংশ দেশেই বিনা বিচারে আটক রাখার মতো অমানুষিক ও বর্বরোচিত ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা যেতে পারে না। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রে দু'ধরনের ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আটক রাখা যেতে পারে না। (ক) আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির কার্যকলাপে সুষ্ঠ তদন্ত কার্যে বাধা সৃষ্টির স্পষ্ট আশংকা বিদ্যমান থাকলে। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে নববীতে খুতবা দিচ্ছেন এমন সময় এক ব্যক্তি তিনবার তার

www.pathagar.com

প্রতিবেশীকে বন্দী করার কারণ নবী করিম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করায় তিনবারের পর হুজুর (সা) তার প্রতিবেশীকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেন। ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে যে, বিনা বিচারে আটক রাখা ইসলাম সম্মত নয়।

১১. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দশম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইসলাম পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার গগণচুম্বী প্রসাদ ভেঙ্গে সুদ, ঘুষ ও অবৈধ আয়ের যাবতীয় পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়ে-এক ইনসাফমূলক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাই বাস্তবে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুঁজিবাদ সৃষ্ট মানুষে মানুষে গগণচুম্বী বৈষম্যের চির অবসান ঘটে। প্রতিটি নাগরিক সেখানে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভে সমর্থ হয়। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হলে কোন ব্যক্তিকেই তার ভবিষ্যৎ বংশধরের সামর্থ নিরাপত্তার জন্যে চিন্তা করে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয় না, জীবন বীমার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। এমনকি বৃদ্ধ ও পঙ্গুরা পর্যন্ত সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। বৃদ্ধ, পঙ্গু ও অকর্মণ্য অবস্থায় অমুসলিম নাগরিকদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের দরজা উন্মুক্ত থাকে। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি পঙ্গু ও কাজের অযোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ভাতা পাওয়ার ন্যায়ত অধিকার রাখে এবং প্রত্যেক নাগরিকের এ অধিকার পাওয়ার ব্যবস্থা করা ইসলাম সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। একমাত্র বাস্তব ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আধুনিক বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অশুভ পরিণতি এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মতো অমানুষিক ব্যবস্থার হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে।

১২. সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও আদর্শভিত্তিক জাতীয়তা

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার একাদশ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে নিয়েই গঠিত হয়ে থাকে তবুও এর পরিধি কালক্রমে সীমিত হয়ে থাকতে পারে না। ইমাম একটি পরিপূর্ণ বিশ্বজনীন আদর্শ। ইসলাম একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম তার আন্তর্জাতিক আহ্বানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র গোলামির ভিত্তিতে মানবতার সত্যিকার মিলন সৃষ্টি করে এক আদর্শবাদী জাতি সৃষ্টি করতে চায়। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভৌগোলিক এলাকা, বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে সৃষ্টি জাতীয়তার কানুন ভেঙ্গে দিয়ে আদর্শবাদী জাতীয়তার বুনিয়াদ স্থাপন করে। মানুষের মধ্যে সত্যিকার জাতীয়তাবোধ ভাষা, বর্ণ ও এলাকার ভিত্তিতে সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও হৃদ্যতাবোধ এ সবের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না। তাই ইসলাম আদর্শিক ভিত্তিতে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক আদর্শবাদী জাতি সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

ইসলামী আদর্শকে স্বীকার করার পরে মানুষ পৃথিবীর যে কোনো স্থানে এমনকি মহাশূন্যে অবস্থান করলেও মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। ইসলামকে যারা গ্রহণ করে তারা এক জাতি আর সমস্ত ইসলাম বিরোধীরা এই আদর্শের বিপরীত আর এক জাতি, জাতীয়তার ক্ষেত্রে এ আদর্শ ও চিন্তাধারাই ইসলাম গড়ে তোলে।

১৩. ভারসাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বাদশ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার অন্যান্য ব্যবস্থার মতো ইসলাম মানব জীবনের একটি দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে না। ইসলাম মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে জীবনের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলেই স্বীকার করে নেয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানাকে স্বীকার করে নিয়ে পুঁজিবাদের জুলুমমূলক ব্যবস্থার পথ মুক্ত করে দিয়ে মানুষকে না খেয়ে মরার স্বাধীনতা দেয় না, আবার অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার নামে মানুষের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তির জন্মগত আজাদীকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আস্তাবলের ঘোড়ায় পরিণত করে না। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে ইসলাম রাজনীতি, অর্থনীতি, আধ্যাত্মনীতি এক কথায় জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে সকল দিকের জন্য সত্যিকার কল্যাণধর্মী, সুসামঞ্জস্য, ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করে। এমনভাবে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে সুসামঞ্জস্য ও সুবিন্যস্ত করে দিয়ে সত্যিকার সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার মতো ইনসাফমূলক ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামেই রয়েছে।

১৪. আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ত্রয়োদশ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতি ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চায়। কোন কুটিল স্বার্থের বশীভূত হয়ে বিশেষ কোনো জোটের তল্পীবাহক হয়ে চলাকে ইসলাম বৈধ বলে ঘোষণা করে না। ইসলাম তার আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে কতিপয় মূলনীতি পেশ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামী মূলনীতিকে আমরা নিম্নোক্তভাবে ভাগ করতে পারি ঃ-

ক) রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে বা আদর্শের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নীতিকে ইসলাম সমর্থন দেয় না।

খ) ইসলামী আদর্শের প্রচার, প্রসার ও আদর্শিক বন্ধু সৃষ্টি ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হতে হবে।

গ) সমগ্র বিশ্ব শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার নীতিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রহণ করবে। অপর কোনো রাষ্ট্রকে বা রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও মতবাদকে অশ্লীল ভাষায়

www.pathagar.com

গালিগালাজ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করবে না। তাদের সঙ্গে ঝগড়া-কলহের সৃষ্টি করবে না। অবশ্য শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অপরের গঠনমূলক সমালোচনা করবে।

ঘ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুর্বলের সহায়তা করবে। অন্য কোন রাষ্ট্র নির্যাতিত হয়ে সাহায্য কামনা করলে তার সাহায্য করবে। যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষ সন্ধি করতে চাইলে সন্ধির সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হলে সন্ধিচুক্তি করবে।

ঙ) আমদানী ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্ব জনগণের জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্য সামগ্রীর উপরই দেবে। রপ্তানী ক্ষেত্রে জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্য সামগ্রীর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তাই রপ্তানী করবে। জনগণকে অভুক্ত রেখে নিছক আর্থিক সুবিধার দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে রপ্তানী করা চলবে না।

চ) শত্রুর উপরও কোনো কালেও জুলুমমূলক ব্যবস্থা স্থাপন করা চলবে না। সর্ব অবস্থায় সুবিচার করে চলবে।

ছ) শান্তিপূর্ণ ও নিময়তান্ত্রিক উপায়ে সমগ্র বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

উপসংহারে বলতে চাই যে, আমাদের দেশ মুসলিম সংখ্যাধিক্য দেশ। এখানকার শতকরা ৮৬ ভাগ অধিবাসী মুসলিম। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এদেশের সরকারের প্রকৃত দায়িত্ব।

আমাদের এ সত্য ভুললে চলবে না যে, ইসলামী আদর্শবাদী নেতৃত্ব ব্যতীত কোনো দিন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই ধীরে ধীরে দেশে সত্যিকার ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সত্যিকার গণতন্ত্রকামী ইসলামপ্রিয়, মজবুত চরিত্র সম্পন্ন সৎ, যোগ্য ও আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকদেরকে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত দেখার ইচ্ছা যদি আমাদের সত্যিই থেকে থাকে তবে তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে ইসলামী নেতৃত্ব অপরিহার্য।

www.pathagar.com

ইব্‌নে খালদুনের রাষ্ট্র দর্শন

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ্

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কালজয়ী চিন্তা, বিস্ময়কর ও যুগান্তকারী প্রতিভা নিয়ে আগমন করে যাঁরা অমর অবদান রেখে গেছেন, মহাত্মা ইবনে খালদুন তাঁদেরই অন্যতম।

রাষ্ট্র দর্শনের ইতিহাসে ও ইতিহাসের বিশ্লেষণের তিনি এক চির ভাস্বর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। সমাজ বিজ্ঞানের দর্পণে ইতিহাসের বাস্তবধর্মী যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, উৎকর্ষতা, প্রগতি, এর পতন অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে তাঁর মননশীল বস্তুনিষ্ঠ, সূক্ষ্ম যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ্য ও অভিনব চিন্তাধারার সংযোজন রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন।

মুসলিম মনীষীর বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংকীর্ণতা বিদ্বেষ ও অজ্ঞতা তাঁর প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ণকে বিলম্বিত করেছে, বর্তমান শতকের রাষ্ট্র দর্শনের মূল্যায়নে তিনি শুধু মুসলিম রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মধ্যেই নয়, বরং রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে সকল দার্শনিকদের মধ্যেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আজ সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে।

রাষ্ট্র দর্শনে তাঁর মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব, সার্বজনীনতা ও চিরন্তনতার কারণেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ তাঁকে প্রাচ্যের "এরিষ্টটল" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মহাত্মা ইবনে খালদুনই ইতিহাসকে দর্শনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী ইবনে খালদুন ছিলেন একাধারে ঐতিহাসিক দার্শনিক, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ তাঁকে যথার্থভাবেই সমাজ বিজ্ঞানের প্রথম প্রবক্তার মর্যাদা দান করেছেন।

ইব্‌নে খালদুনের রাষ্ট্র দর্শনকে মৌলিকভাবে চারটি সুবিন্যস্ত স্তরে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ইব্‌নে খালদুনের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাবুল ইবার' 'এর ভূমিকায় যার নাম "মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন" অংশে রাষ্ট্র দর্শন সম্পর্কে তার চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরেছেন। মুকাদ্দামায় তিনি ঐতিহাসিক ঘটনারাজীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন যে, বিশ্বের যে ব্যক্তি যত মহৎ, যে ঘটনা যত গুরুত্বপূর্ণ তার সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝিও তত বেশি প্রকট। মুকাদ্দামায় ইবনে খালদুনের মধ্যে তার রাষ্ট্রদর্শনকে তিনি নিম্নোক্ত চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন–

www.pathagar.com

১) আসাবিয়াহ বা গোষ্ঠী সংহতি তত্ত্ব।

২) ঐতিহাসিক যুক্তিবাদ।

৩) ইতিহাসে সমাজ বিজ্ঞানের গুরুত্ব।

৪) রাষ্ট্র দর্শনে অর্থনীতির প্রভাব।

আসাবিয়াহ বা গোষ্ঠী সংহতি তত্ত্ব

ইবনে খালদুন কিতাবুল ইবারকে চার খণ্ডে রচনা করেন। প্রথম খণ্ড যা মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন নামে পরিচিত, এ অধ্যায়েই তিনি রাষ্ট্রচিন্তার পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

মুকাদ্দামায় তিনি রাষ্ট্রকে "দওলত" নামে অভিহিত করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্র দর্শনে যাকে "হুকুমাত" (State) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবনে খালদুনের সংজ্ঞা হচ্ছে, "দওলত"। ইবনে খালদুনের মতে দওলত বা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ও উৎপত্তিই হচ্ছে আসাবিয়াহ বা গোষ্ঠী সংহতি। মানুষের জীবনধারণ, জীবন ও সম্পদের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মানুষ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগীতার প্রয়োজন অনুভব করে। জৈবিক, সামাজিক, নৈতিক ও যৌন প্রয়োজনের তাকিদে মানুষ পরস্পর সংঘবদ্ধ ও মিলিত হয়। এ ভাবেই উদ্ভব ঘটে গোষ্ঠী সংহতি বা আসাবিয়াহ তত্ত্বের।

ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, উত্থান, উদ্ভব বিকাশ, উন্মেষ, উৎকর্ষতা ও প্রগতি তার পতন, ধ্বংস, বিপর্যয় ও অবক্ষয় সব কিছুই নির্ভর করে আসাবিয়াহ বা গোষ্ঠীর আনুপাতিক পরিমাণের উপর।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ ইবনে খালদুনের গোষ্ঠী সংহতি বা আসাবিয়াহর সম্পর্কে বলেন যে, মানুষের সামগ্রিক কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে সমভাবাপন্ন কতিপয় মানুষকে চিন্তা ও লক্ষ্যের ঐক্যের ভিত্তিতে সম্মিলিত দায়িত্বশীলতা, অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুভূতি ও চেতনার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়। 'দওলত' বা রাষ্ট্র ও রাজবংশের সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ সংযুক্তি, চেতনা ও অনুভূতিই গুরুত্বপূর্ণ চলচ্ছশক্তি ও উৎস হিসাবে কাজ করে। উপরোক্ত চেতনা অনুভূতি ও ঐক্যবদ্ধতাকেই "আসাবিয়াহ" বা গোষ্ঠী সংহতি বলে ইবনে খালদুন আখ্যায়িত করেছেন। সমাজ ও সংঘের মতে জীবনবোধ, জীবনধারণ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সংহতি বা আসাবিয়াহর চেতনায় রয়েছে তীব্র প্রয়োজন। ইবনে খালদুনের মতে, এ চেতনা ধর্মভিত্তিকও হতে পারে আবার নিরপেক্ষও হতে পারে। ইবনে খালদুনের মতে যুগ চক্রের আবর্তে ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধর্ম তথা সম্প্রদায়ভিত্তিক চেতনা অনেক দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করে না। ইবনে খালদুনের মতে অভ্যন্তরীন সংহতি ও জীবনবোধের ঐক্য ছাড়া "দওলত" বা রাষ্ট্রে উৎপত্তি ঘটে না।

www.pathagar.com

ইব্‌নে খালদুন রাষ্ট্রীয় সমাজের উদ্ভব ও উৎপত্তির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, গোষ্ঠী সংহতি বা আসাবিয়াহর উদ্ভব ঘটে মানুষের পরিবার বা জাতিত্ববোধের চেতনা থেকে। এভাবে গোষ্ঠী সংহতির ধারণা থেকে ক্রমশই গোষ্ঠী সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে প্রতিযোগিতা, সংঘাত ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ্বে শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বল গোষ্ঠীর উপর বিজয় লাভ করে, অতঃপর বিজয়ী শক্তি তথা বিজয়ী গোষ্ঠীই রাষ্ট্রের রূপ লাভ করে এবং রাষ্ট্রীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্র সমাজে পরিণত বিজয়ী গোষ্ঠী বিশেষ যোগ্যতা, প্রতিভা ও শক্তির বলে অন্য সব ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত ও আওতাধীন করে পরাজিত ও পরাভূত করে ক্রমাগত পরিধির বিস্তৃতি ঘটায়। আর তা সাম্রাজ্যের রূপ লাভ করে। আবার সমাজ বিবর্তনের স্বাভাবিক গতিতেই কালের প্রভাব বিজয়ী শক্তি পর্যায়ক্রমে দুর্বল হতে থাকে, গোষ্ঠী সংহতি ঐক্য ও চেনতার ধারণাও ক্রমশঃ ক্ষীণতর হতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সমাজের লোকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে, ফলে একদিন রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হয়।

ঐতিহাসিক যুক্তিবাদ

ইব্‌নে খালদুনের বিস্ময়কর সৃজনশীল অমর প্রতিভার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে ইতিহাস দর্শনে তাঁর পেশকৃত চিন্তাধারার মধ্যে। তিনি ইতিহাসকে ঘটনা প্রবাহের সংরক্ষণের সংকীর্ণ চিন্তাধারার গণ্ডী থেকে দর্শনের সম্মানিত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। ইতিহাসের সূক্ষ্ম মননশীল, বাস্তবধর্মী, যুক্তিবাদী মর্যাদা ও চিরন্তর গৌরবের আসনে সমাসীন করে রেখেছে। ইতিহাসের ক্রমবিকাশের বিবর্তনবাদী বৈশিষ্ট্যের সঠিক বিশ্লেষণ তিনি সর্ব প্রথম উপস্থাপন করেছেন। শাশ্বত সার্বজনীন মানবতাবাদের প্রেক্ষাপটে তিনি ইতিহাসের বিশ্লেষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইব্‌নে খালদুন হচ্ছেন সমাজে বিজ্ঞানের বা সমাজতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা। কোন কোন পণ্ডিত প্রবর তাকে সমাজ বিজ্ঞানের প্রথম প্রবর্তক না বলে 'সমাজতন্ত্রের' প্রথম প্রবর্তক বলে উপস্থাপিত করেছেন।

অমর সমাজ বিজ্ঞানী রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম সাধক ইব্‌নে খালদুনের মতে " ঘটনারাজীর সুবিন্যস্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশন ও মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের উত্থান-পতনের প্রাণবন্তু উপস্থাপনের নামই শুধু ইতিহাস নয়, বরং বিবর্তনশীল সমাজের সুসংবদ্ধ ও সুরক্ষিত দলীলই হচ্ছে ইতিহাস।" তিনি আরও অভিমত পেশ করেছেন যে "ইতিহাস কেবল ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিবরণ নয়, বরং মানুষের কার্যাবলীর সঠিক বিবরণ, সভ্যতা বিকাশের অমর কাহিনী, সমাজ বিপ্লবে ও মানব প্রকৃতিতে যে সকল পরিবর্তন নীরবে নিভৃতে ও অলক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সাধিত হচ্ছে তার সম্যক উপলব্ধি, যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এবং সঠিক মূল্যায়নই হচ্ছে ইতিহাসে, অন্যতম কাজ।"

www.pathagar.com

তিনি ইতিহাসের সমাজ বিজ্ঞানের দার্শনিক পটভূমিকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, "ইতিহাসের বিবর্তন নানাভাবে প্রকাশ পায় সামাজিকতায়, সভ্যতায় রাষ্ট্র গঠন, রাজ্যজয়, শিল্পকলা, সংস্কৃতি নৈতিক উৎকর্ষতা অবক্ষয় ও বর্বতায় সর্বত্র এর প্রতিফলন ঘটে। ইতিহাস হচ্ছে মানব সমাজের সামগ্রিক জীবনধারা ও প্রতিনিয়ত বিবর্তনের ইতিবৃত্ত। ইতিহাসের বিবর্তন কোন ভৌতিক বা আকস্মিক ব্যাপার নয়, বরং প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই তা ঘটে থাকে। তিনি বলেন, "ঐতিহাসিককে অবশ্যই যুক্তিবাদী বিশ্লেষণধর্মী হতে হবে, ঘটনারাজির চমকপ্রদ বিবরণের নামই শুধু ইতিহাস নয়।"

ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান

ইব্‌নে খালদুন সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজ দর্শনের আলোকে ইতিহাসের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মুকাদ্দামায় অভিমত পেশ করেছেন যে, "কোন ঐতিহাসিক যদি ইতিহাসকে সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না করতে পারেন তবে তার পক্ষে ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

ইতিহাসের উত্থান ও পতনের ক্ষেত্রে ভৌগলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সমাজ বিজ্ঞানের জগতে এক অভিনব অবদান রেখেছেন ইব্‌নে খালদুন। তিনি বলেন, সভ্যতার বিকাশে রাষ্ট্রীয় সংগঠনে ভৌগলিক অবস্থান, উৎপন্ন দ্রব্য ও আবহাওয়া এক সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

সমাজ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়নে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরাই বেশি অবদান রাখতে পারেন।

উষ্ণ, রুক্ষ ও মরু অঞ্চলের জনবসতি জীবন যাত্রা দুর্বিসহ ও কঠোর হওয়ার ফলো প্রতিভার বিকাশ ব্যাহত ও সার্বিক উন্নতি প্রশমিত হয়। ইব্‌নে খালদুনের মুকাদ্দামা হচ্ছে, সমাজ বিজ্ঞানের আদি গ্রন্থ। তিনি ছিলেন সমন্বিত প্রতিভার অধিকারী। দার্শনিকগণ যথার্থভাবেই তাঁকে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলে মূল্যায়ন করেছেন।

রাষ্ট্র দর্শনে অর্থনীতির প্রভাব

ইব্‌নে খালদুনের মতে রাষ্ট্রীয় সমাজে গোষ্ঠী সংহতির চেতনা শিথিল হওয়ার ফলে গণজীবনে আনুগত্যহীনতা প্রকাশ পায়। তখন শাসক গোষ্ঠী কঠোর শাসনের মধ্যে জনগণকে অনুগত রাখার জন্য বিভিন্ন বাহিনী পোষণ করে।

তাদের বেতনের খাতে বিপুল পরিমাণ অংকের অর্থ সম্পদ ব্যয়ের কারণে গণজীবনে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। পরবর্তীকালে এ ধুমায়িত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করে রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, এভাবে শাসকগোষ্ঠী তার বিলাসের প্রয়োজন এবং বেতনভূক ভাড়াটিয়া বাহিনীর প্রয়োজন পূরণের জন্য গণজীবনে নুতন নতুন কর ভার চাপিয়ে দেয়। শুরু হয় গণজীবনে নির্যাতন, নির্যাতিত জনতা বিদ্রোহ শুরু করে, কঠোর দমন-নীতি শুরু করলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর জনগণ ও শাসক গোষ্ঠীর এ সংঘাতের অনিবার্য পরিণত স্বরূপ শুধু রাজ পরিবারই ধ্বংস হয় না বরং রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যেরও পতন সাধিত হয়।

ইব্নে খালদুন মধ্যযুগে জন্ম গ্রহণ করে শুধু রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবেই নয় আধুনিক ধন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও তিনি একজন সার্থক অর্থনীতিবিদ বলে প্রমাণিত হয়েছেন।

ইব্নে খালদুন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সুচিন্তিত অভিমত পেশ করে বলেন যে, স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার কায়েমে সুষ্ঠু, ন্যায়নীতি ভিত্তিক সামাজিক সুবিচারমূলক অর্থ ব্যবস্থা অপরিহার্য। সামাজিক সুষ্ঠু বন্টননীতি, সুষম বাজেট ও পরিকল্পনা ছাড়া অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ইব্নে খালদুন আরও বলেন যে, জনগণের উপর অতিরিক্ত কর ভার লাঘব করা ছাড়া কল্যাণ রাষ্ট্র ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ইব্নে খালদুন আরও বলেন, স্থিতিশীল রাষ্ট্র কল্যাণকর সমাজ ও শান্তিপূর্ণ সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য লঘুকর ব্যবস্থা। সহজলভ্য জীবন যাত্রার ব্যবস্থা সম্পন্ন করাা ছাড়া জনগণের মধ্যে শাসকের প্রতি আনুগত্যশীলতা, দেশপ্রেম ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টি সম্ভব নয়। অতিরিক্ত কর ভারে জর্জরিত জীবনযাত্রা সহজলভ্য ব্যবস্থা হতে বঞ্চিত জগণের মধ্যে ক্রমশই আনুগত্যহীনতা বৃদ্ধি পায় ও কর্মস্পৃহা দমিত হয়।

ইব্নে খালদুন তাঁর মুকাদ্দামায় আরও উল্লেখ করেছেন যে, শান্তিপূর্ণ সুখী সমৃদ্ধশালী স্থিতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী কর ব্যবস্থার প্রবর্তনই সর্বোত্তম পদ্ধতি। তিনি বলেন, ভূমির খেরাজ ও বিভিন্ন পরোক্ষ কর ব্যবস্থার পরিবর্তে জনগণ ও সরকারের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক স্থাপন ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার জন্য যাকাত, ওশর, গনিতম, 'খনিজ প্রাচীন কালের সঞ্চিত সম্পদ থেকে "খুমুস" (পঞ্চাংশ কর) আলকায় ইত্যাদি কর ব্যবস্থা প্রবর্তনই উত্তম পদ্ধতি। ইসলামের কর ব্যবস্থা যেহেতু প্রত্যক্ষ ও লঘু তাছাড়া জনগণ ও শাসক গোষ্ঠীর চাপানো ব্যবস্থার পরিবর্তে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান বলে মেনে নেয় তাই সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সামাজিক সুবিচার (ইনসাফ) ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।" –(আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল)

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/২৪৭২ (উ)—৩২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ